ফেমাস
অ্যাডভেঞ্চারস

ফেমাস অ্যাডভেঞ্চারস

সম্পাদনা
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী
১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা পুস্তক মেলা, ১৯৯১

প্রকাশিকা ঃ
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর ঃ
গোপালচন্দ্র পাল
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ কানাইলাল চক্রবর্তী

মূল্য ঃ তিরিশ টাকা

Famous Adventures
Edited by : Ushaprasanna Mukherjee
Published by
Sasadhar Prakasani
10/2/B, Ramanath Mazumder Street,
Calcutta-700009
Price : Rs. 30·00 only

উৎসর্গ

পিতৃদেব ৺উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

যা বলবার

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ যেমন করে ঝর্ণা নামে দুর্গম পর্বতে / নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতের পথে। যুগে যুগে বহু নরনারী বিপদ, দুর্ঘটনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বাধা-বিপত্তি এমনকি মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে অজানিতের পথে ওই ভাবেই অভিযান চালিয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন চার্লস ডারউইনের মত বিজ্ঞানী, হাওয়ার্ড কার্টারের মত প্রত্নতাত্ত্বিক, পিৎজারোর মত ভাগ্যান্বেষী সৈনিক-অভিযাত্রী কিম্বা গারট্রুড বেলের মত দুঃসাহসিক মহিলা। এঁরা দুর্গমকে জয় করতে,অজানাকে জানতে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে চালিয়েছেন নিত্য-নতুন অভিযান। এইসব অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী কখনো পুরনো হবার নয়। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে ঃ অনেক সময় সত্য ঘটনা গল্পের থেকেও বিস্ময়কর হয়। এই সংকলনের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয়ত তেমন ধারণা জাগবে।

তবে মানুষের অ্যাডভেঞ্চারের তো শেষ নেই। আদিম যুগ থেকেই শুরু হয়েছে মানুষের অজানাকে জানার অভিযান। গুহামানবেরা বশ করেছে বন্য পশুকে, জেনেছে প্রকৃতির নানা রহস্য, পাড়ি দিয়েছে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে। বৈদিক কাহিনীতে আছে, বালক নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যা জানতে গিয়েছিল নিষিদ্ধ যমালয়ে। মহাভারতে দেখি পঞ্চপাণ্ডব চলেছেন হিমালয়ে মহাপ্রস্থানের পথে। রামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযানের কাহিনী কে না জানে। ট্রয় যুদ্ধ শেষে স্বদেশ ফেরার পথে সেনাপতি ওডেসিউস জড়িয়ে পড়েছিলেন নানা রোমাঞ্চকর অভিযানে। তাই নিয়েই লেখা হয়েছে 'ওডেসি' মহাকাব্য। এছাড়া গ্রীক ও রোমক পুরানে রয়েছে মহাবীর হারকিউলিস, পার্সিউস, ইনিয়াস এবং জ্যাসনের নানা বিচিত্র অভিযান কাহিনী। গিলগামেশ (ইরাকের প্রাচীন মহাকাব্য) শাহনামা (ইরানের মহাকাব্য), বেউলফ (ইংরাজী ভাষার আদি মহাকাব্য) প্রভৃতিতেও মানুষের নানা রোমাঞ্চকর অভিযান প্রাধান্য পেয়েছে। সংস্কৃত বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর, রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থেও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সেগুলি কাল্পনিক।

ঐতিহাসিক কালেও মানুষ কখনও আত্মরক্ষার তাগিদে, কখনও ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে, কখনও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে, কখনও ব্যবসায়িক স্বার্থে বা লোভে, কখনও অজানা দুর্গমকে জয় করার ইচ্ছায় এবং আবিষ্কারের নেশায় পাড়ি দিয়েছে অজানিতের পথে। মিশরের ফ্যারাও-এর অত্যাচারে

অতিষ্ঠ হয়ে ইহুদি নেতা মোজেস সমস্ত ইহুদিদের নিয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন দুর্গম মরুপথে, প্যালেস্টাইনের সন্ধানে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান গিয়েছিলেন নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে। পয়গম্বর হজরত মহম্মদ মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান সত্য রক্ষার জন্য। রোমান সম্রাটদের অত্যাচারে খ্রিস্টানরা এই ভাবেই দেশ-দেশান্তরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেড লড়বার জন্য 'সিংহহৃদয়' রাজা প্রথম রিচার্ড পাড়ি দিয়েছিলেন হাজার হাজার মাইল। কৃষক কন্যা জোয়ান-অব-আর্ক ফরাসি দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর অভিযানে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত শহীদ হন। হিউ-এন-সাঙ, ইৎ-সিঙ, আল বেরুণী, মার্কো পোলো, ভাস্কো-ডা-গামা, থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার, পিৎজারো পর্যন্ত নানা ধরণের অভিযাত্রী যুগে যুগে নানা উদ্দেশ্যে দুর্গম পথে অভিযান চালিয়েছেন। স্কট, আমুণ্ডসেন, এডমণ্ড হিলারি, নীল আর্মস্ট্রং প্রমুখ অভিযাত্রীরা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কি ভাবে দুর্গমকে জয় করেছিলেন সে তো আজ সর্বজনজ্ঞাত ইতিহাস।

এই গ্রন্থে তেমন বিখ্যাত রোমাঞ্চকাহিনী সংকলিত হয়নি। অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত অথচ একদা সাড়া জাগানো কিছু কাহিনী বেছে নিলাম আমরা। এই সব অ্যাডভেঞ্চার আখ্যানে দেখা মিলবে নানা রকমের নর-নারীর। তাঁদের মধ্যে আছেন হিউ এন সাঙের মত জ্ঞানপিপাসু ধর্মগুরু, স্বর্ণসন্ধানী সৈনিক অভিযাত্রী পিৎজারো, গারট্রুড বেলের মত বিদুষী গৃহবধূ, রোসিটা ফোর-বেসের মত দুঃসাহসিকা এবং সহনশীলা সুন্দরী তরুণী, হাওয়ার্ড কার্টারের মত প্রবীণ প্রত্নতাত্বিক, হেয়ারধালের মত সাধারণ বৈমানিক, সেলকার্কের মত জলদস্যু, কিংবা মার্গারিটের মত ভাগ্যবিড়ম্বিতা রাজকন্যাও। অখ্যাত রাখাল-বালকও হয়ে উঠেছে বিস্ময়কর আবিষ্কারের নায়ক।

সবশেষে এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে দুজনকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়। প্রথম জন প্রকাশিকা শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় জন সাংবাদিক লেখক সত্যব্রত দাস। শ্রীমান দাস এই গ্রন্থ সম্পাদনায় নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া যাঁদের লেখায় এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন পাঠক পাঠিকার কাহিনীগুলি ভাল লাগলে আমাদের চেষ্টা ও শ্রম যথার্থ মর্যাদা পাবে। তেমন উৎসাহ পেলে আমরা প্রকাশ করব এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড।

সম্পাদক

সূচীপত্র

গারট্রুড বেলের আরব অভিযান

গারট্রুড বেল তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। খোদ বিলেতের ধনী ও শিক্ষিত পরিবারের কন্যা হয়েও তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছিলেন আরব দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে। কেউ তাঁকে বলত—পুবের রহস্যময়ী নারী, কেউ বলত—ইরাকের মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী, কেউ বলত—মরুভূমির ডায়না—এরকম আরও কতো কী। এসব আখ্যার মূল কারণ অপরিচিত আরব দুনিয়ার দেশগুলিতে তাঁর অসমসাহসিক অভিযান। এখন এসব ব্যাপার তত আশ্চর্যের মনে না হলেও আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগে ভাবাই যেত না।

শ্রীমতী বেল ছিলেন তাঁর বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে সত্যিই এক ব্যতিক্রম। পড়াশোনাতে তিনি ছিলেন যেমন মেধাবিনী, তেমনি দুঃসাহসিক কাজেও সমান পারদর্শিনী। একাধারে তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, পর্বতারোহী, সুদক্ষ প্রশাসক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর চরিত্রবল, ব্যক্তিগত সাহস আর আরব জনগণের জন্য সহিষ্ণু ভালবাসা।

'সহিষ্ণু ভালবাসা' কথাটা একটু খটোমটো ঠেকতে পারে, কিন্তু বেলের অভিযানের বিবরণ জানলে এই শব্দটাই সঠিক মনে হবে। এর আগে এই অসম সাহসিনীর ব্যক্তিগত পরিচয় কিছুটা জেনে নেওয়া যাক।

গারট্রুড ছিলেন স্যার হিউজ বেলের প্রথম পক্ষের কন্যা। গারট্রুডের ঠাকুর্দা ছিলেন আইজাক লোথিয়ান বেল। তিনি ছিলেন কয়লা খনির মালিক। তাছাড়া মিডলসবরোতে বিরাট ইস্পাত

ও লোহা শিল্পও ছিল তাঁর। পরে তিনি 'স্যার' উপাধিও পেয়েছিলেন। শুধু শিল্পপতি হিসেবে নয়, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রূপে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো বা সদস্য ছিলেন। এরকম পারিবারিক পরিবেশে গারট্রুডের জন্ম ১৮৬৮ সালে। উদার ও মননশীল পরিবেশে তিনি বড় হয়েছিলেন বিমাতা লেডি ফ্লোরেন্স বেল ও পিতার সাহচর্যে। পড়াশোনায় ভালো ফল করে ১৮৮৭ সালে অক্সফোর্ডে ইতিহাসে তিনি প্রথম হলেন। এভাবেই তখনকার গুণীজন সমাজে তিনি পরিচিতি পেলেন।

পড়ুয়া হিসেবে বেল ভালো ছিলেন ঠিকই কিন্তু সেজন্য জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে তিনি নিস্পৃহ ছিলেন না। যৌবন কালে তিনি ন্যাচ শিখেছিলেন, স্কেটিং করতেন, অসি চালনা শিখেছিলেন। লণ্ডনের পার্টিতে তিনি যেমন ঝকঝকে আকর্ষণ, আবার তেমনি গ্রামের দিকে শিকারেও উৎসাহী। এরকম করেই জীবন কাটছিল বেলের। কিন্তু জীবনের মোড় ঘুরে গেল তেহেরানে মামার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। মামা ফ্রাঙ্ক ল্যাসেলেস তখন তেহরানে বৃটিশ মন্ত্রী। সেই প্রথম প্রাচ্যের জাদুতে পড়লেন বেল। সেই জাদুর সম্মোহন রয়ে গেল বেলের সারা জীবন ধরে।

ভ্রমণের নেশা ছিল বেলের রক্তে। পথ কখনও বেলকে টেনে নিয়ে যেতো ইউরোপে, কখনও নিকট প্রাচ্যে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বেল সর্বদাই ঘুরে বেড়াতেন। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর জাহাজে পাড়ি দিতে দিতে তিনি লিখেছিলেন—পৃথিবী দর্শন বড় আনন্দের।

কিন্তু এই আনন্দ মানে লঘুচিত্ততা নয়, স্রেফ মজা নয়। এই বিপুলা পৃথিবীকে তিনি গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। সব সময় তিনি কিছু না কিছু পড়তেন, খুঁজতেন। এই অনুসন্ধিৎসু মনের কোন সীমা ছিলনা। বেল ছিলেন পণ্ডিত, কবি, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, কলা সমালোচক, প্রকৃতিবিদ, রাজ-নীতিক। একাধারে এতো বিষয়ে আগ্রহ দেখান সহজসাধ্য ব্যাপার

নয়। একথা সত্যি যে তিনি জন্মেছিলেন ধনীর ঘরে, রুপোর চামচ মুখে নিয়ে। কিন্তু কজন ধনীর দুলালী তাঁর মতো সেই সম্পদ দেশের কাজে লাগিয়েছেন ?

ধনীর ঘরে বেলের জন্ম হলেও শুয়ে বসে আলস্যে দিন কাটাননি বেল। রোমহর্ষক নানারকম অভিযানের ঘটনায় তাঁর জীবন পূর্ণ। তিনি সুইজারল্যাণ্ডের দুর্গম পর্বতারোহণ যেমন করেছেন, তেমনি এশিয়া মাইনরের সুদূর এলাকায় রোমান সভ্যতার খুঁটিনাটি ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়েছেন। মনে রাখতে হবে এসব কাজ তিনি করেছেন রক্তপিপাসু বেদুইনদের এলাকার মধ্যেই—মানুষের গলা কাটা যাদের কাছে জলভাত। এমনকি হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘায় ওঠার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল—তখন তাতে ওঠার কথা কেউ চিন্তাই করত না।

সত্যিকথা বলতে কি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এশিয়া মাইনর ও উত্তর আরবের সীমান্তবর্তী এলাকার ওপর বেল ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তখন ওই এলাকার সবটাই ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর সেই সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল পূর্বে কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) থেকে ইউক্রেতিসের গোড়া পর্যন্ত—যার মধ্যে ছিল সমস্ত ইরাক। আর দক্ষিণের দিকে ছিল আধুনিক তুরস্ক—যার মধ্যে ছিল অনেক দেশ—এদের এখন আমরা চিনি সিরিয়া, লেবানন, ইসরায়েল, জর্ডন এবং এল হেজাজ ও আমির প্রভৃতি নামে। এ অঞ্চল বিস্তৃত ছিল পূর্ব উপকূলে লোহিত সাগর থেকে এডেন পর্যন্ত। মনে রাখতে হবে তুরস্ক আরবের অনেক ভেতরের এলাকাও জয় করে নিয়েছিল। কিন্তু জয় করলে কী হবে, ও সব জায়গায় তখনও সভ্যতার আলো তেমনভাবে পেঁছয়নি এবং ওখানকার বিভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠী, যারা বন্যতার জন্য বিখ্যাত, তারা নাম কা ওয়াস্তেও শাসকগোষ্ঠীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি।

এই শতকের গোড়ার দিকে সউদি আরবের রাজা ইবন সউদ

মধ্য আরব থেকে তুর্কীদের তাড়াতে আরম্ভ করলেন। তাঁরই নেতৃত্বে বেদুইনদের বিভিন্ন ভ্রাম্যমান গোষ্ঠী কৃষিকেই প্রধান উপজীব্য করে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় এখানেই ঘটেছিল টি. ই. লরেন্সের বিখ্যাত আরব অভিযান। 'লরেন্স অব অ্যারেবিয়া' ছবির কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য! এই লরেন্স কিন্তু পুরোপুরি ভাবে গারট্রুড বেলের দুঃসাহসিক অভিযানের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছিলেন। আরবের অভ্যন্তরে বেল তার অভিযান চালিয়েছিলেন ১৯১৩র শীত থেকে ১৯১৪ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত।

অনেকদিন আগে থেকেই বেল এই অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, কেননা তিনি জানতেন এই অভিযান হবে খুবই কঠিন ও ভয়ঙ্কর। ১৯১৩ সালের নভেম্বরে বেল আলেকজান্দ্রিয়া গেলেন। সেখান থেকে দামাস্কাস।

দামাস্কাসে গিয়ে যা খবর পেলেন তাতে বেল আশ্বস্ত হলেন। যেমন মরুভূমিতে যে সব উপজাতিরা পুরুষানুক্রমে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছে তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে একটা রফায় এসেছে। তাই মরুভূমি তখন শান্ত। ২৯শে নভেম্বর বেল লিখছেন —'আরবে যাবার এমন সুবিধে আর কখনও হয়নি। ইবন আল রসিদের রাজধানী হাইলে যেতে কোন অসুবিধাই হবে না—হয়ত ওর চেয়ে বেশি ভেতরেও যাওয়া যেতে পারে।'

মনে রাখতে হবে ইবন রসিদ রাজত্বের সঙ্গে তুরস্ক ও ইবন সাউদের নিরন্তর লড়াই চলছিল তখন। যাইহোক দামাস্কাসে পৌঁছে গারট্রুড বেল তাঁর অভিযানের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। তিনি সতেরোটা উট কিনলেন সাজসজ্জা সমেত। গড় পড়তা দাম পড়ল ১৩ পাউন্ড। খাবার দাবার নিলেন পঞ্চাশ পাউন্ডের। আরবদের পোষাক কিনলেন পঞ্চাশ পাউন্ডের—যা উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। নগদ রাখলেন ৮০ পাউন্ড। আর দুশো পাউন্ডের ঋণপত্রের ব্যবস্থা করলেন নেজডের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যাতে

হাইলে গিয়ে টাকাটা তিনি পেতে পারেন। অর্থাৎ তাঁর অভিযানের জন্য খরচ গিয়ে দাঁড়াল প্রায় ৬০০ পাউন্ড। ১৯১৩ সালে ৬০০ পাউন্ডের মূল্য ছিল এখনকার থেকে অনেক বেশী। বেল তাঁর ব্যাংক থেকে শুধু অতিরিক্ত টাকা তুললেন না, বাবার কাছ থেকে অগ্রিম টাকাও নিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল এই অভিযানের ওপর একটা বই লিখবেন যাতে অভিযানের খরচ উঠে যাবে।

দামাস্কাসের স্থানীয় বাজারে ১২ই ডিসেম্বর বেলকে এক বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হল। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ইবন রসিদের প্রতিনিধিও। এই ইংরেজ রমণীর প্রস্তাবিত সফর সম্পর্কে তিনি ইতিমধ্যেই হাইলেস্থিত প্রভুকে অবহিত করেছিলেন।

কিন্তু শুরুতেই যাত্রায় দেখা দিল বিপত্তি। তাঁর প্রিয় পথ প্রদর্শক ফত্তু টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, তাছাড়া অন্যান্য কারণেও দেরী হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত গাইড ফত্তুকে ছাড়াই বেল কিছুটা হতাশ ভাবেই যাত্রা শুরু করলেন।

বেল তার অভিযানকে দু পর্বে ভাগ করেছিলেন। প্রথম পর্ব ছিল সিরিয়ান মরুভূমিতে মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। তিনি চেয়েছিলেন বুর্কাতে বাইজানটাইন চৌকির ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে দেখতে। তাছাড়া জেবেল সাইসে একটা মৃত আগ্নেয়গিরি দেখার ইচ্ছেও তার ছিল।

সিরিয়ান মরুভূমিতে শীতকালের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর হয়নি। সারা মরুভূমি বরফে সাদা হয়ে যেত। রাত্তিরে কনকনে ঠান্ডা। বৃষ্টি আর হাওয়ার দিনগুলো খুবই কষ্টকর। উটগুলো কাদার মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। সবাই ভিজে একশা—মনে হতো ঠান্ডা যেন হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

শীতল রাত্রি কিন্তু বেলের উৎসাহ এতটুকু দমাতে পারেনি। জনমানব শূন্য ধু ধু মরুভূমিও ছিল বেলের কাছে দারুণ আকর্ষণীয়। তিনি লিখেছিলেন—নিঃস্তব্ধতা এবং একাকীত্ব যেন দুর্ভেদ্য ঘোমটার মতো ঘিরে রাখে। সুদীর্ঘ সময়ের যাত্রা ছাড়া

আর কিছুই সত্যি মনে হয় না।

সাতদিন চলার পর ওরা এসে পেঁছিলেন আরব মেশপালকদের এক আস্তানার কাছে। এরা এসেছিল জেবেল দ্রুজে পাহাড়ী এলাকা থেকে। ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে শূন্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা এগিয়ে এল। সত্যিই সে এক শ্বাসরুদ্ধকারী মুহূর্ত।

তারা এসে বেলের লোকজনদের ঘিরে ফেলল। তারপর কেড়ে নিল রিভলভার, কার্তুজ বেল্ট এবং জামাকাপড়। চোখের সামনে এসব দেখতে দেখতে বেল ভাবছিলেন এবার বোধহয় সবই গেল। কিন্তু উটের পিঠে বসে শান্তভাবে সব কিছু দেখা ছাড়া তাঁর আর কিছু করার ছিল না।

ভাগ্য ভালো ওই সব শেখরা বেলের দুই গাইড আলি আর মহম্মদকে চিনতে পারল। তখন তারা লুণ্ঠিত সব জিনিস ফেরত দিয়ে দিল।

এই সব হিংস্র মেষ পালকদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। ক্রিসমাসের দিনটা তারা কাটালেন বুর্কা দুর্গতে। বাইজানটাইন আমলের এই চৌকিতে কয়েক শতাব্দী ধরে কোন ইউরোপীয়ানের পা পড়েনি। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে বেল আবার পশ্চিম দিকে রওনা দিলেন। টাইফয়েড সারার পর ফত্তু এসে দলে যোগ দিল আম্মানে।

এর পর ক্যারাভান এগোল নেকাদের দিকে। এটা হল আরবের কেন্দ্রীয় অঞ্চল। বলা হয় আরব জাতির উৎসমূল এই জায়গাটাই। এই জায়গাটাতেই আছে মাইলের পর মাইল বালির পাহাড়, শুকনো নদীর খাত, যেখানে কদাচিৎ জলের ধারা বয়।

গারট্রুড বেল নেকাদে প্রবেশ করলেন ১৯১৪-র জানুয়ারিতে। বসন্তের আগমনে তখন মরুভূমিতেও সবুজের ছোঁয়া লেগেছে। অভিযাত্রী দলের উটগুলো আশে পাশে গাছ গাছড়া খেতে খেতে চলল। এতে যাত্রার গতিও গেল বেশ কমে। মরুভূমি তখন বাগানের মতো সাজানো। অভিযাত্রীরা চাইল উটগুলো ভালো

করে খেয়ে গায়ে জোর বাড়িয়ে নিক কেননা সামনে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ নিষ্পত্র বালির এলাকা।

এইভাবে তারা দিনের পর দিন সোনালী লাল বালির পাহাড় পেরিয়ে চলল একটার পর একটা। ৮ই ফেব্রুয়ারী তারা আবার এক আরব আস্তানার অধিবাসীদের মুখোমুখি হল। এই অধিবাসীরা দাবি করল গারট্রুড বেলকে এখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাদের যুক্তি, আরবের এই এলাকায় কখনও কোন খৃষ্টান ঢোকেনি—তাই বেলকেও ঢুকতে দেওয়া হবে না। তারা বেলের গাইড ফত্তুর কাছে এমন প্রস্তাবও করল যে বেলকে খুন করে তার জিনিসপত্র লুঠ করার কাজে সে সহায়তা করুক। কিন্তু ফত্তু এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত লুঠেরারা বেলকে অক্ষত অবস্থাতেই যেতে দিল। নেকাদের ভেতরের আরবরা অবশ্য বেলকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিল, যদিও তারা জীবনে কোনদিন ইউরোপীয়ান দেখেনি। এদের কথা ভেবেই হয়ত বেল লিখেছিলেন—'মরুভূমির শিষ্টাচার সুন্দর।'

এইভাবে অনেক পথ পেরিয়ে নেকাদ ছাড়িয়ে শেষে হাইলিতে পৌঁছলেন বেল। হাইলিতে খুবই শীতল অভ্যর্থনা পেলেন তিনি। জানতে পারলেন আরও দক্ষিণে যাবার অনুমতি নেই। শুনতে পেলেন আমীর বিদ্রোহী উপজাতিদের শায়েস্তা করতে অভিযানে বেরিয়েছেন। বেলকে নিয়ে যাওয়া হল আরব্য রজনীর ধাঁচের এক প্রাসাদে এবং জানিয়ে দেওয়া হল অনুমতি ছাড়া তিনি যেন রওনা না হন।

বেল যখন জানালেন দুশো পাউন্ডের ঋণপত্রটি তিনি ভাঙাতে চান তখন তাঁকে বলা হল যেহেতু এর সঙ্গে আমীরের কোষাগারের সম্পর্ক আছে তাই আমীরের না ফেরা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। কেননা, যে লোকের সঙ্গে বেলের চুক্তি হয়েছিল তিনি আমীরের সঙ্গেই বাইরে গেছেন এবং মাসখানেকের আগে তার হাইলি ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই।

বেল চটে গিয়ে খুব স্পষ্টভাবেই বললেন সেক্ষেত্রে তিনি পরের দিনই ফিরতে চান। এই সাফ কথায় কাজ হল। মুখ্য খোজা একজন লোককে দিয়ে দুশো পাউন্ড নিয়ে এল। সে এও জানাল বেল যখন খুশি যেতে পারেন। শুধু তাই নয়, যা খুশি ছবি তিনি তুলতে পারেন। এই ব্যাপারটার গুরুত্ব খুবই বেশি, কেননা ছবি তোলার ব্যাপারে আরবরা খুবই স্পর্শকাতর।

শোনা যায় এই আকস্মিক মত পরিবর্তনের পেছনে ছিলেন তুর্কীয়া নামে এক সারকেশিয়ান মহিলা। ককেশাস পর্বতের উত্তরে সারকেশিয়া প্রদেশের মেয়ে তুর্কীয়া যখন খুব ছোট তখন সুলতান তাকে উপহার হিসেবে তুলে দেন মহম্মদ আল রসিদের হাতে। পরে তুর্কীয়া হারেমের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহিলা হিসেবে গণ্য হন। এই মহিলার সঙ্গে বেলের বন্ধুত্বের সুবাদেই প্রশাসনিক মত পরিবর্তন।

দক্ষিণে যাবার অনুমতি না থাকায় বেল ঠিক করলেন উট-বাহিনীকে উত্তরপূর্ব দিকে অর্থাৎ বাগদাদের দিকে নিয়ে যাবেন। তিনি ভেবেছিলেন আমীরের সঙ্গে দেখা হবে পথে। কেননা, তিনি সন্নিহিত মরু এলাকাতেই যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু দেখা হল না।

গণ্ডগোল এড়ানোর জন্য গারট্রুড 'রফিক'দের নিয়োগ করে-ছিলেন। যাত্রাপথে বেল যে উপজাতিদের দেখা পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে এদের নেওয়া। এরা বেলের ক্যারাভানের সঙ্গে যেত। পথে যখন কোন নতুন উপজাতির সঙ্গে দেখা হত তখন এই রফিকরাই মৈত্রীদূতের কাজ করত। রফিকদের জনসংযোগ কাজের জন্য বেল উপজাতিদের কাছে অতিথির মর্যাদা পেতেন, শত্রু হিসেবে পরিগণিত হতেন না। মরুভূমির এক অলিখিত নিয়ম হল, এখানকার সবচেয়ে হিংস্র, খুনী উপজাতির লোকরাও দলের সঙ্গে 'রফিক' থাকলে কোন রকম অসম্মান করবে না। এরকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে যে কিছু খুনে উপজাতির লোক গারট্রুড বেলের 'রফিক'দের বলেছে তারা যেন বেলকে পরিত্যাগ করে। তাহলে

খুন করে লুঠে নিতে তাদের সুবিধে হবে। কিন্তু 'রফিক'রা মরুভূমির নিয়ম মেনেই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। মরুভূমির সীমানায় অবশ্য এই নিয়মটা মানা হয়নি—কেননা সেখানকার উপজাতিরা বেদুইনদের এই নিয়ম মানে না। বাগদাদের অদূরেই বেলের এই অভিজ্ঞতা হয়।

যাইহোক বেল নিরাপদেই বাগদাদে পেঁছিলেন ২৯শে মার্চ। এই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক অভিযানের জন্য তিনি যথেষ্ট সম্বর্ধনাও পেলেন। তারপর তিনি সিরিয়ান মরুভূমি অতিক্রম করে ফিরে গেলেন দামাস্কাসে। পথে পড়ল জনশ্রুতির ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর পামীর।

গারট্রুড বেলের এই যাত্রাকে শুধু দারুণ অভিযান বললে ভুল হবে, কেননা এর সঙ্গে তথ্যানুসন্ধানের কাজও ছিল। তিনি ওই এলাকার ম্যাপে মরুভূমি এলাকার কুয়োর অবস্থান লিপিবন্ধ করেন যা আগের মানচিত্রে নথিভুক্ত ছিল না। এছাড়া রোমান, পামীরাইন, ওম্মায়েদ রাজত্বের অনেক নতুন ঐতিহাসিক তথ্যও তিনি আবিষ্কার করেন এই সফরে।

এছাড়া গারট্রুড বেলের এই ঐতিহাসিক অভিযানের আরও একটি তাৎপর্য ছিল। সেই বছরের শেষের দিকে যখন যুদ্ধ বাধে এবং হাইলি ব্রিটেনের শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে ইউক্রেতিসের দিকে বিপদ ঘনিয়ে আনে তখন বৃটিশ সরকার বেলের সংগৃহীত তথ্যকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এছাড়া ১৯১৭-১৮ সালে লরেন্সের মরু যুদ্ধের সময় বেলের সংগৃহীত উপজাতিগত তথ্য অপরিসীম কাজে এসেছিল।

গারট্রুড বেলের বাকি জীবনটা আরব জাতির জন্যই ব্যয়িত হয়েছিল। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯২১ সালে আমীর ফজল ইরাকের রাজা হন। আমীরের রাজত্বের প্রথম দিকে বেল ছিলেন তাঁর প্রধান শক্তি। ইরাককে তিনি এতো ভালোবেসেছিলেন যে সে দেশ ছাড়তেই চাননি। পরে তিনি বাগদাদের পুরাতত্ত্ব

বিভাগের সাম্মানিক অধ্যক্ষ হন। বাগদাদেই তিনি ইরাক মিউজিয়ামের স্থাপনা করেন। এই মিউজিয়ামের প্রধান শাখা এখনও তাঁর নাম বহন করে চলেছে। অপরিসীম টানা কষ্টসাধ্য কাজের ভারে ক্লান্ত বেল্ মাত্র ৫৮ বছর বয়সে ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে বাগদাদে পরলোকগমন করেন। বাগদাদেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বাস্তবের রবিনসন ক্রুসো

কে আছে এমন যার কাছে অপরিচিত রবিনসন ক্রুসো নামটি। অথবা ড্যানিয়েল ডিফো। বলে দিতে হবে কি এ দুয়ের সম্পর্ক? অবশ্যই না। অথচ কজন আজ মনে রেখেছে এ প্রসঙ্গে অপরিহার্য আর একটি নাম। যে নামের বাস্তব চরিত্রটি ডিফোর কলমে উপন্যাসের রূপ পেয়ে হয়ে আছে রবিনসন ক্রুসো। দূর মহা-সমুদ্রে এক জনহীন দ্বীপে পরিত্যক্ত সেই জলদস্যু আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক-কে নিয়ে স্বনামধন্য কবি উইলিয়ম কুপারও লিখে গেছেন এক কবিতা। প্রায়শ উদ্ধৃত তার প্রথম লাইনটি ঃ আমি একা রাজা যতদূর যায় দৃষ্টি (আই অ্যাম মনার্ক অব অল আই সারভে)।

কুপারের কবিতার এই আমি হলেম সেলকার্ক। রোমাঞ্চকর তার জীবন কাহিনী। জন্ম ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে, স্কটল্যান্ড-এ। গ্রামের নাম লারগো। ছোটবেলা থেকেই বয়ে যাওয়া ছেলে। অবশ্য আজকের দৃষ্টিতে এখন যা গুণ্ডামি তখন তা ছিল স্বাভাবিক আচরণ। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। সেইসব দিনে নাবিক মানেই বলতে গেলে ছিল জলদস্যু। স্থানীয় ভাষায় যাদের বলা হত বুকানীয়ার। সেসময় সদ্য আবিষ্কৃত নতুন পৃথিবীর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও ধনসম্পদের পাহাড় যেন ছিল স্পেনের নিজস্ব সম্পত্তি। স্প্যানিয়ার্ডদের হাত থেকে যতটা সম্ভব তা কেড়ে নেওয়া তখন ছিল ইংরেজ ও ফরাসী বুকানীয়ারদের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য সাধন করত তারা পশুর চেয়েও হিংস্র উপায়ে। তখনকার ভাষায় তাই ছিল বীরত্ব। দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার। বড় হয়ে

বুকানীয়ার হব, শিশু সেলকার্ক সংকল্প নিল।

ছোট্ট গ্রাম লারগো। আলেকজাণ্ডার-এর মত ছেলেকে ধরে রাখতে পারে? মুচি বাবার সাত নম্বর ছেলে তার আর ছ' ভাইকে দিনরাত মারধোর করত। সারা গ্রাম উত্যক্ত তার অত্যাচারে। সবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। একদিন শমন এল স্থানীয় গির্জা থেকে। সেদিনই চম্পট। দস্যি ছেলে কোথায় পালাল কেউ জানেনা। হয়ত বা গিয়েছিল সাগরে জলদস্যুর পেশায় হাতেখড়ি নিতে। ছ' বছর তাকে দেখা যায়নি গ্রামে।

দেখা গেল যেদিন, ১৭০১ সালে, সেদিন তার অন্য চেহারা। এক কথায় ভয়ঙ্কর। হাতের পিস্তল, তলোয়ার উঁচিয়েই আছে। গোটা গ্রাম সন্ত্রস্ত। আবার ডাক পড়ল গীর্জায়। এবারে অবশ্য তাকে নানা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে হল। এর কিছু পরেই সুযোগটা এল ছোটবেলার স্বপ্ন সফল করবার।

ডাকসাইটে জলদস্যু ক্যাপটেন উইলিয়ম ড্যামপিয়ার-এর নেতৃত্বে দুটি জাহাজ দক্ষিণ সমুদ্রে অভিযানের জন্য তৈরি। তারই একটিতে কাজ বাগিয়ে নিলেন আলেকজাণ্ডার। নব্বই টন জাহাজটির নাম সিঙ্ক পোর্ট। এতে ১৬টি কামান, নাবিক সংখ্যা ৬৩। বুয়েনস এয়ার্স বন্দরে তিনটি ধনরত্নে বোঝাই জাহাজ লুঠ করতে হবে। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে এগিয়ে যেতে হবে পেরুর উপকূল বেয়ে, সোনা বোঝাই তিনটি জাহাজের পিছু নিয়ে। তাছাড়া উপকূলের স্প্যানিশ শহরগুলিতেও লুটে নেবার মত রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ। সবই যদি শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায় তখন লক্ষ্য হবে এ্যাকাপালকো থেকে ম্যানিলার পথযাত্রী সোনা বোঝাই জাহাজটি।

কিনসেল বন্দর থেকে ১৭০৩ এর সেপ্টেম্বর মাসে জাহাজ দুটি ছাড়ল। যাত্রার শুরুতেই নানা বিপদ দেখা দিল। রগচটা ড্যামপিয়ার-এর সঙ্গে ঝগড়া করে এক নাবিক জাহাজ থেকে নেমে গেল কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জে। এর পরই আর এক নাবিকের বিদ্রোহ।

সে আটজন ক্রু সঙ্গে নিয়ে ব্রাজিল উপকূলের লে গ্রান্দেজ দ্বীপে নেমে গেল। ঠিক এই সময় সিঙ্ক পোর্টের ক্যাপটেন-এর মৃত্যু হল। তাঁর জায়গায় ক্যাপটেন হলেন স্ট্র্যাডলিং। তিনি আবার ড্যামপিয়ার-এর চাইতেই হিংস্র ও একরোখা।

চিলির কাছাকাছি হুয়ান ফারনান্ডেজ দ্বীপের উপকূল থেকে কিছু দূরে জাহাজ দুটি দাঁড়াল। অমনি শুরু হল নতুন করে গোলমাল। বিদ্রোহই বলা যায়। স্ট্র্যাডলিং-এর জাহাজ ছেড়ে নেমে গেল অনেক নাবিক। জাহাজ প্রায় খালি। এমন সময় দূরে দেখা গেল এক ফরাসী জাহাজ। এটি ম্যাজিকের কাজ করল। ড্যামপিয়ারের ডাকে সাড়া দিয়ে নেমে যাওয়া নাবিকদের অনেকেই জাহাজে ফিরে এল, জাহাজটি ধেয়ে গেল ফরাসী জাহাজের দিকে। কিন্তু বৃথা। দুটি ইংরেজ জাহাজই আবার ফিরে গেল হুয়ান ফারনানডেজ দ্বীপে। যে কজন নাবিক তাড়াহুড়োয় জাহাজে উঠতে পারেনি তাদের তুলতে। কিন্তু তোলা হল না। সামনে এসে পড়ল এক সঙ্গে অনেকগুলি ফরাসী জাহাজ—বিরাট এক বহর। ইংরেজদের পালাতে হল উত্তরে। পেরুর উপকূলের দিকে।

এর পর দুমাস কেটে গেল। এই সময়টা জাহাজ দুটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ছোটখাট হানা চালিয়ে যায়। লুট-প্যাটও কিছু হয়, তবে যৎসামান্য। বৃথা পরিশ্রম। এর পর দুই ক্যাপটেনে শুরু হল কাজিয়া। লুঠের বখরা নিয়ে। কাজিয়া ছড়িয়ে গেল দুই জাহাজের নাবিকদের মধ্যে। শেষটায় প্রায় গৃহযুদ্ধ। একসময় থেমেও গেল। তখন শুরু হল নাবিকদের জাহাজ বদল। একসময় সেলকার্ক-ও ভেবেছিলেন স্ট্র্যাডলিং এর জাহাজ ছেড়ে ড্যামপিয়ার-এর জাহাজে যাবেন। কিন্তু শেষটায় মত পালটালেন।

সিঙ্ক পোর্ট আবার পাল তুলল ১৭০৪-এর ১৯মে। তিন মাস ধরে মেক্সিকোর উপকূল বেয়ে চলেও কিছু মিললনা। এতদিনে সেলকার্ক-এর পদোন্নতি হয়েছে। এখন ফার্স্ট মেট। স্ট্র্যাডলিং-

এর সঙ্গে ঝগড়া তিনি এড়িয়ে চলেন। এক এক সময় মনে মনে শপথ নেন, স্ট্র্যাডলিং-এর অধীনে কাজ আর করবেন না। সেপ্টেম্বরে স্ট্র্যাডলিং হুয়ান ফারনাণ্ডেজ দ্বীপে ফিরে এলেন। তিন মাস আগে ছেড়ে আসা ছজন নাবিক ও কিছু খাবার দাবার জাহাজে তুলে নিতে হবে। দ্বীপে পৌঁছে দেখা গেল ছ'জনের চারজনকে ফরাসীরা নিয়ে গেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে সব খাবার দাবার। যে দুজন রয়ে গেছে তারা সেলকার্ক-কে কথায় কথায় বলে, দ্বীপ তো নয় যেন স্বর্গ। শুনেই সেলকার্ক-এর মনে চমক লাগে। ভাবেন এই সুযোগে আমিও জাহাজ থেকে নেমে পড়ি। থেকে যাই এই অতিসুন্দর দ্বীপটায়। এই ভেবে মনস্থির করে ফেলেন। বলেও দেন মনের কথা। শুনেতো স্ট্র্যাডলিং মহা খুশি। বাঁচা গেল। শেষ পর্যন্ত এই অবাধ্য, উদ্ধত ফার্স্ট মেটটা ঘাড় থেকে নামল।

জামা-কাপড়, বিছানাপত্র, কিছু বই, যন্ত্রপাতি, ছুরি একটা কুড়ুল, একটা বন্দুক বেশ কিছু গুলি গুছিয়ে তৈরি হলেন সেলকার্ক। বারুদ বেশী নেওয়া হল না, মোটে এক পাউণ্ড। খাবারও অল্প। এ দুটিরই বাড়ন্ত ছিল। এইসব মালপত্র একটা কাঠের সিন্দুকে ভরে নৌকায় তুলে দেওয়া হল। নৌকাটি সেলকার্ককে নিয়ে গিয়ে দ্বীপের উপকূলে নামিয়ে দিল। হঠাৎ কি হল, সেলকার্ক চেঁচিয়ে উঠল, "এ কি করলাম।" ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে চিৎকার করে বলে, "ফিরে যাব জাহাজে, আমাকে নিয়ে যাও।" কিন্তু ততক্ষণে নৌকা প্রায় ফিরে গেছে জাহাজে। হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন নৌকাটি জাহাজে উঠল, নোঙর তুলে জাহাজ রওনা হল। সেলকার্ক-এর দৃষ্টিতে ক্রমে ছোট হতে হতে একটা কালো বিন্দুর মত হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। বুক ফেটে কান্না এল সেলকার্ক-এর। কি করে থাকব এখানে। একা। একেবারে একা। যদি না পারি ফিরতে আর কখনও! কেন হল এই মতিভ্রম! দুঃখে, হতাশায় শুয়ে পড়লেন মাটিতে।

সন্ধ্যে গড়িয়ে এল। সেলকার্ক উঠে বসেন। তেষ্টা পেয়েছে।

কাছে এক ঝরণা থেকে জল খেলেন। সামনে এক পাথরের কুটীর দেখে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন। এটি তৈরি করেছিল এক আমেরিকান ইন্ডিয়ান বছর কুড়ি-তিরিশ আগে। সে এখানে তিন বছর বাস করেছিল। আরতো কিছু করবার নেই, এখানেই থাকতে হবে। মালপত্র টেনে এনে কুটীরে তুললেন। যেমন তেমন একটা বিছানা পেতে নিলেন। সিন্দুকটা টেনে দরজার কাছে এনে কপাটটা চেপে দিলেন। কি জানি, যদি দ্বীপে আর কোন মানুষ থাকে। যদি ঘুমের মধ্যে এখানে এসে চড়াও করে।

রাত কাটল, ঘুম ভাঙল পরদিন অনেক বেলায়। সামান্য যা খাবার ছিল তা থেকে খানিকটা খেয়ে নিয়ে সেলকার্ক বেরোলেন। দ্বীপের কোথায় কি খাবার পাওয়া যায় দেখতে। চোখে পড়ল দলে দলে ছাগল। তবে দ্রুতপদ, ধরা শক্ত। বারুদ বেশী নেই গুলি করা চলবে না। সমুদ্রের ধারে এসে কয়েকটি সীল চোখে পড়ল। ছুরি দিয়ে ছোট একটা সীল মারলেন। এক জাতের গলদা চিংড়ি চোখে পড়ল জলে। ঝাঁকে ঝাঁকে। এগুলো ধরা সহজ। সুস্বাদুও। খাওয়াটা ভালই হল। এই অর্থে, যে আরও তো খারাপ হতে পারত!

দিন যায়। সেলকার্ক রোজই দ্বীপের এক উঁচু পাহাড়ে ওঠেন। দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকান– সাগর যেখানে সুদূর দিগন্তে মিশেছে। যদি চোখে পড়ে কোন জাহাজ। পড়েনা। কি হবে যদি অসুখ বিসুখে পড়ি। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে? ভাবতে ভাবতে মনটা দমে যায়। বসে বসে ভাবেন, দুর্ভাবনায় কষ্ট পান। অদৃষ্টে কী যে আছে। খিদে পেলে উঠে যান খেতে।

কখনও সখনও এক আধটা পাখী বা ছাগল গুলি করে মারেন। গুলিটা নিজের বুকে ঢুকিয়ে দেওয়া কত সহজতর। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠেন। আত্মহত্যা! সে তো মহাপাপ। বাইবেল থেকে এটা শিখেছেন। শিশুকালে। আস্তে আস্তে মৃত্যু ইচ্ছা চলে যায়। শান্তি ফিরে আসে। বাড়ী, ঘর, বন্ধু, আত্মীয়র স্মৃতি মনকে কষ্ট

দেয়না। আনন্দও যেন ফিরে আসে। ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছেন আলেকজান্ডার সেলকার্ক।

আঠার মাস কাটল। মনের জোর ফিরে পেয়েছেন সেলকার্ক। আবার শীত আসে। এগিয়ে আসে মুষলধারে বৃষ্টির দিন। নাঃ, এই আবহাওয়ায় এই ছোট্ট পাথরের কুটিরে কষ্ট করে বাস আর নয়। দুটো নতুন কুটীর গড়ে তুলতে হবে। একটি বাসের একটি রান্নার। বেশ একটু উঁচু জায়গায়। গাছপালার আড়ালে। জাহাজে আসা স্প্যানিশ বোম্বেটেদের দৃষ্টির অগোচরে।

দ্বীপটিকে ঘুরে ফিরে বেশ করে দেখে নিলেন। মোটামুটি ত্রিকোন। আঠার মাইল লম্বা বার মাইল চওড়া। এক মাইল দূরে আরও একটি দ্বীপ। অনেক ছোট যদিও। দ্বীপের দক্ষিণ ভাগ নীচু। গাছপালা নেই। শুধু কাঁকর। বাকীটা পাহাড়ী অঞ্চল, জঙ্গলে ঢাকা। এই অঞ্চলেই এক টিলার উপর কুটীরের ভিত্তি বসানো হল। চারদিকে পিমেণ্টো গাছের সারি। আশে পাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গজিয়ে উঠেছে মুলো, বাঁধাকপি, টারনিপ। হুয়ান ফার্নানডেজ যার চাষ শুরু করেছিলেন এখানে। একশ বছর আগে এ দ্বীপে পা দেন ওই স্প্যানিশ নাবিক। তাকে এ দ্বীপটির অধিকার দেওয়া হয়েছিল, ছাগলও তিনিই এখানে এনে ছেড়ে দেন। সেই সবেরই বংশ বৃদ্ধি এখানে হয়েছে।

খাওয়াটা এখন থেকে তবে ভালই হবে। কেন যে এতকাল কষ্ট করলেন। ইচ্ছে করেই। নতুন উৎসাহে কুটীর তৈরির কাজে লেগে এইসব ভাবেন সেলকার্ক। পিমেণ্টো গাছের গুঁড়ি দিয়ে দেয়াল, ছাত সব হল। ছাত ছাওয়া হল খড় দিয়ে। জানলা, দরজা সব হল। মেঝের মাটী চাপড়ে সমান করা হল। তক্তার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির সময় যদি জলের ছাঁট আসে—আটকাতে ছাগলের চামড়া দিয়ে দেয়াল ঢাকা হল। অনেক ছাগল মারা পড়ল। মালপত্র নতুন ঘরে স্থানান্তর করতে অনেক পরিশ্রম হল।

রান্না শেষ করার আগেই শীত এসে গেল। বাইরে অবিরত

বৃষ্টি, সারাদিন ঘরে বসে করবার মত অনেক কাজ তখনও বাকী। একে একে সারতে লাগলেন। আসবাবপত্র, উনুন, চামড়ার লাইনিং তৈরি করলেন।

ছাগল শিকার করতে করতে গুলি, বারুদ প্রায় শেষ। ছাগল ধরা ফাঁদই বা কি করে তৈরি করা যায়। চুপি চুপি ছাগলের পিছনে পিছনে গিয়ে খপ করে ধরে ফেলতে হবে। এটা রপ্ত করতে কিছু সময় লাগল। বাচ্চা ধরা তো কোন ব্যাপার নয়। আর বাচ্চা ধরলে মায়েরা দাঁড়িয়ে পড়ে, তাড়া করলেও পালায় না। তখন মায়েদের ধরাও আর কোন সমস্যা নয়। এর পর দৌড়ে বড় বড় পাঁঠা ধরাটাও আর কঠিন কাজ রইল না টানা এক বছর অভ্যাসের পর।

কুটীর সাজানো শেষ হল। ভেতরে আরামে দিন কাটে। দ্বীপের জীবন এখন বেশ উপভোগ্য। সেলকার্ক ছাগল ছানাদের নাচ শেখালেন। ঘরে ইঁদুরের উৎপাত ছিল। কোন এক জাহাজ থেকে ইঁদুরগুলো দ্বীপে নেমে এসেছিল। একদিন কয়েকটি বিড়াল ছানা চোখে পড়তেই ধরে ফেললেন। ছাগলের দুধ খাইয়ে বড় করে বেড়ালগুলোকে ইঁদুরের পেছনে লেলিয়ে দিলেন। আর দেখতে হল না। সব ইঁদুর পালিয়ে গেল।

ক্রমে দ্বীপের এই জীবনে অভ্যস্থ হয়ে গেলেন আলেকজাণ্ডার। সময় হুহু করে কেটে যায়। কতকালের পুরনো পোষাক ছিঁড়ে যেতে থাকে। ছাগলের চামড়া দিয়ে কিছু নতুন পোষাক তৈরি করতে হবে। সূচ, কাঁচি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চাই। জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া কত পিপে ঢেউয়ের ধাক্কায় দ্বীপের উপকূলে আছড়ে পড়ে। সেগুলি থেকে লোহার পাতগুলি খুলে নিয়ে নিজেই তৈরি করে নেন সব যন্ত্রপাতি। চামড়া কেটে পাতলা সরু ফিতে বার করে তাই দিয়ে হয় সেলাইয়ের কাজ। ফাঁকে ফাঁকে চাষের কাজ। বাঁধাকপি, টারনিপ, পার্সনিপ আরও কত কি। বন থেকে তুলে নিয়ে আসেন পাকা বুনো প্লাম ফল। সারাদিনে

বিশ্রাম নেই। এতদিনে অনেক কটি ছাগল পাঁঠা বন থেকে ধরে এনে পোষ মানিয়েছেন। মাংসের জন্য তাদের হত্যা করতে মন চায়না। চলে যান জঙ্গলে বুনো ছাগল শিকারের উদ্দেশ্যে। এমনি করে দ্বীপে একা আরামে বাস করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে মনটাকে এক রকম তৈরি করে নিলেন সেলকার্ক।

গোলমাল করে দিল দুটি ঘটনা। অথবা দুর্ঘটনা। প্রথমটি নিয়ে এল এক ছাগল। ছুটে গিয়ে ছাগলটাকে ধরতে দিলেন এক লাফ। ছাগলটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল এক খাদের কিনারায় এসে সেটা বুঝতে পারেন নি। পড়ে গেলেন খাদের নীচে। হাড় ভাঙ্গেনি, কিন্তু ব্যাথায় তিনদিন অচৈতন্য। জ্ঞান ফিরতে কোন মতে ঘরে ফেরেন। বিছানায় পড়ে থাকেন দশ দিন। এ দশ দিনের খাবার ঘরে মজুত ছিল তাই রক্ষে।

দ্বিতীয় ঘটনায় প্রাণরক্ষা হয় আরও আশ্চর্যভাবে। এক সকালে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছেন, দৃষ্টিপথে এল এক জাহাজ। জাহাজ দেখলেও কখনও নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা ভাবেন না, কি জানি যদি হয় স্প্যানিশ জাহাজ! সেদিনের জাহাজটি যেন মনে হল ইংল্যাণ্ড-এর। নেমে ছুটলেন উপকূলের দিকে। কাছে আসতে সভয়ে টের পেলেন ওটি আসলে স্প্যানিশ জাহাজ। অমনি ছুট দিলেন। জাহাজ থেকে গুলি ছোঁড়া হল। কপাল গুণে গুলি তাঁর গায়ে লাগল না। জাহাজ নোঙর করে, স্প্যানিয়ার্ডরা দ্বীপে নামল। নামার পর অনেক খুঁজেও সেলকার্ককে পেলনা। তিনি এমন করে লুকিয়ে ছিলেন। তিন দিন পর বোম্বেটেরা জাহাজে উঠে চলে গেলে তিনি বেরিয়ে এলেন। সেই থেকে ঠিক করলেন কোন দেশের তা নিশ্চিত না হয়ে জাহাজের দৃষ্টিপথে আসবেন না।

এর কিছুদিন পর এক সন্ধ্যায় দুটি জাহাজ দেখা দিল। দুটিই ইংরেজদের। নিঃসন্দেহ হবার পর জেগে উঠল মনের এক সুপ্ত বাসনা। আবার মানুষের মাঝে ফিরে যাই। জাহাজ দুটি

তখনও অনেক দূরে। সেলকার্ক ছুটে গিয়ে পাহাড়ের চুড়ায় উঠলেন। একটা জায়গা বেছে নিয়ে জড়ো করলেন শুকনো পাতা। কাঠ কুটো। দিলেন জ্বালিয়ে। কয়েক ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলল।

জাহাজ দুটির নাম দ্য ডিউক ও দ্য ডাচেস। অভিযানের নেতৃত্বে ক্যাপটেন উডস রজার্স। আগুন দেখে তিনি ভাবলেন হয়ত্ বা স্প্যানিয়ার্ডরা এ দ্বীপে ঘাঁটি গেড়েছে। অথবা কোন ফরাসী জাহাজ কাছাকাছি নোঙর ফেলেছে। অথবা দ্বীপে বোম্বেটেরা বাস করছে। জাহাজ দ্বীপে লাগাবেন কিনা ভাবতে গিয়ে দ্বিধায় পড়লেন ক্যাপ্টেন। এদিকে জাহাজে পানীয় জল ফুরিয়ে এসেছে। জল নিতে হবে এই দ্বীপ থেকেই। তখন সব রকম বিপদের জন্য তৈরি হয়ে অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই এক নৌকোয় ছজন সশস্ত্র নাবিককে দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া হল। তারা উপকূলের কাছাকাছি এসে দেখতে পেল ছাগলের চামড়ার পোষাক পরা এক নিরস্ত্র ইংরেজ দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। হাতে এক সাদা রুমাল। তারাও সেলকার্ককে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল। ইসারায় নৌকোয় উঠে আসতে বলল। সেলকার্ক নৌকোয় উঠে শোনালেন তাঁর কাহিনী। কে না মুগ্ধ হবেন এ কাহিনী শুনে।

এদিকে কিরকম যোগাযোগ। দুই জাহাজের একটিতে রয়েছেন ড্যামপিয়ার। পাইলটের পদে। ক্যাপ্টেন রোজার্সকে তিনি সেলকার্কের প্রশংসা করে অনেক কথা বললেন। রোজার্স সেল-কার্ককে নিয়ে নিলেন দ্য ডিউক জাহাজে। ফার্স্ট মেট-এর পদে।

দ্বীপে নেমে রোজার্স ঘুরে দেখলেন। এমন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। খুব ভাল লেগে গেল। দুই জাহাজের কয়েকজন নাবিক অসুখে ভুগছিল। দ্বীপের জল হাওয়া তাদের ভাল করে তুলবে নিশ্চিত হয়ে তাঁদের নামালেন। সেলকার্ক-এর কুটীরে তাদের থাকবার ব্যবস্থা হোল। কয়েক দিনের মধ্যে যেন যাদুমন্ত্রবলে সবাই সুস্থ হয়ে উঠল। যাবারও সময় হল। দ্বীপের ছাগল-পাঁঠা ফলমূল শাকসব্জী, পানীয় জল ভর্তি করে নিয়ে জাহাজ দুটি ছেড়ে দেওয়া হল।

সেটা ছিল ১৭০৯-এ ফেব্রুয়ারী মাস। সেলকার্ক ঘরে ফিরলেন ১৭১১-র অক্টোবর মাসে। মাঝখানের এই সময়টা ক্যাপটেন রোজার্স এর জাহাজ দুটি দক্ষিণ সাগরে বেশ কয়েকটি জাহাজ আক্রমণ করে। লুঠের পরিমাণ ভালই হয়। এতে সেলকার্ক-এর বখরা আটশ' পাউন্ড। যবদ্বীপ, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে জাহাজ দুটি অবশেষে ইংলণ্ডের উপকূলে এসে লাগল।

সেলকার্ক-এর ফিরে আসার খবর বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। মুখে মুখে ঘোরে জনহীন দ্বীপে দীর্ঘকাল তার একাকী বাসের কাহিনী। রূপকথার মত। ডিফোর উপন্যাস ও কুপারের কবিতা লেখা হয় অবশ্য আরও পরে।

দেশে ফিরে সেলকার্ক বিয়েও করেন। কিন্তু ঘরে মন বসাতে পারেন নি। শোনা যায় সেই ছেড়ে আসা দ্বীপের জীবন ধারার স্মৃতি তাঁকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে। হয়ত বা আবার ফিরে যাবার চিন্তাও তাঁকে পেয়ে বসে, নয়তো স্বদেশে জনসমুদ্রের মাঝেও ওইরকম একটি নির্জন আশ্রয়ের স্বপ্ন তিনি দেখেন। তাঁর জীবনের শেষাংশের কথা এর বেশী আর কেউই জানেনা।

আমাজন আবিষ্কার

সময়টা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিক। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একটা বিরাট অংশ তখন স্প্যানিশ ও পর্তুগীজদের দখলে। ইউরোপে রেনেসাঁসের উন্মাদনা তখন তুঙ্গে। অজানা দেশ, নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের নেশা এই নবজাগরণের একটি অভিব্যক্তি। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বেয়ে ফ্রান্সিসকো পিৎসারোর দুঃসাহসিক অভিযান, এবং কিছুকাল পরে তাঁর পেরুজয়ের কাহিনী, ইউরোপবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সুবর্ণ নগরী এল ডোরাডো এবং দারুচিনি দ্বীপের স্বপ্নে তামাম পশ্চিম দুনিয়া বিভোর। তারপর ১৫৩১ সালে দুর্গম আন্দেজ পর্বত ডিঙ্গিয়ে পিৎসারো জয় করলেন ইংকাদের রাজধানী সূর্যনগরী কুজকো (cuzco)। দক্ষিণ আমেরিকায় স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে আর একবার প্রমাণ করলেন যে মানুষের অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে কিছু নেই। স্প্যানিশ আমেরিকার ইতিহাসে পিৎসারোর বীরত্ব ও রণকৌশলের বিবরণ অবশ্যই অমর হয়ে থাকবে। তবে তাঁর কীর্তির চেয়ে কোন অংশে কম রোমাঞ্চকর নয় ফ্রান্সিসকো ওরেলানার আমাজন আবিষ্কার। এল ডোরাডো অভিযানের অন্যতম অভিযাত্রী ওরেলানা খুঁজতে গেলেন খাবার, পেয়ে গেলেন বিশ্বের বৃহত্তম নদী। অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ভাবেই। দীর্ঘতম নদী না হলেও অসংখ্য উপনদী সহ আমাজনের অববাহিকার জলরাশি পৃথিবীতে বৃহত্তম ও গভীরতম।

ব্যাপারটা সবিস্তারেই বলা যাক। ১৫৪০ সালে ফ্রান্সিসকো

পিৎসারোর সৎ ভাই গনজালো পিৎসারো কুইটো অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হন। এই সময় খোদ স্পেনের রাজধানী থেকে এক হুকুম এল তাঁর উপর। সোনার শহর এল ডোরাডো ও দারুচিনি দ্বীপ খুঁজে বার করতে হবে তাঁকে। এ আর এমন কি কঠিন কাজ? শ' আড়াই স্প্যানিয়ার্ড, হাজার চারেক উৎসাহী আদিবাসী (যাদের স্প্যানিয়ার্ডরা বলত 'ইন্ডিয়ান'), কিছু ঘোড়া, লামা, শুয়োর ও কয়েক হাজার কুকুর নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেই হয়। গনজালো পিৎসারো এক কথায় রাজী। ফ্রান্সিসকো পিৎসারোর এক আত্মীয় ফ্রান্সিসকো ওরেলানা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন গনজালো পিৎসারোর অভিযানে অংশগ্রহণ করার। দুজনে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন সোনার খোঁজে।

ন্যাপো নদী বেয়ে পুব দিকে কিছুদূর গিয়ে কয়েকটা দারু-চিনি গাছের দেখা পেলেও সেগুলি পিৎসারোর বিশেষ মনঃপুত হল না। কয়েকজন ইন্ডিয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। তাদের মুখ থেকে কিছু জানা গেল না; রেগে গিয়ে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হল। কিছু ইন্ডিয়ান মরল কুকুরের কামড়ে কিছু আগুনে পুড়ে। আরও কিছুদূর গিয়ে আর এক দল আদিবাসীর দেখা মিলল। তাদের সর্দার ডেলিকোলা হয়ত তার হতভাগ্য স্বজাতীয়দের দুর্গতির কথা জানতে পেরেছিল কোনও ভাবে। সে ফেঁদে বসল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এক দেশের গল্প যার হদিশ নাকি মিলবে আরও পূবে গেলে। এই অভিনব গল্পের পুরস্কার হিসাবে ডেলিকোলা লাভ করল গনজালো পিৎসারোর দাসত্ব এবং সেই রূপকথার রাজ্যে অভিযাত্রীদের পৌঁছে দেবার দায়িত্ব। পিৎসারো ও ওরেলানার দলটা এগিয়ে চলল আরও পূবদিকে। এদিকে খাবার ফুরিয়ে এসেছে অথচ খাবার লোক বেড়েছে।

এমন সময় খবর এল, এক বিশাল নদীর খোঁজ পাওয়া গেছে, যার দুই পাড়ে সুসভ্য উপজাতিদের বাস। নতুন উৎসাহে গনজালো পিৎসারো ধেয়ে চললেন সেই নদীর দিকে; কিন্তু দেখা পেলেন না

সেই সুসভ্য উপজাতিদের। তারা স্প্যানিয়ার্ডদের আসার খবর পেয়ে সময় থাকতেই পালিয়েছে। জনশূন্য গ্রাম থেকে পাওয়া গেল শুধু কয়েকটা নৌকো, যেগুলিকে বলা হয় ক্যনু (conoe)।

একে তো খাবারের ভাণ্ডার প্রায় খালি, তার উপর আর এক বিপদ হ'ল, সঙ্গের আদিবাসীদের নিয়ে। পাহাড়ী উপজাতিরা সমতলের আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে একেবারে নিঃশেষে প্রাণত্যাগ করল। অবস্থা দেখে পিৎসারো ঠিক করলেন একটা বড় নৌকো (brigantine) তৈরি করে তাতে অস্ত্রশস্ত্র এবং অবশিষ্ট খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তাই হ'ল; জলে নৌকো এবং ডাঙায় ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে চললেন পিৎসারো এবং ওরেলানা। খাবার কমতে কমতে এক সময় একেবারে শেষ হয়ে গেল। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে ওরেলানার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তিনি প্রস্তাব দিলেন, বড় নৌকাটা, কয়েকটা ক্যনু এবং ৬০ জন সঙ্গী নিয়ে তিনি যাবেন খাবারের খোঁজে। অনন্যোপায় পিৎসারো প্রস্তাব মেনে নিলেন, তবে এই সর্তে যে খাবারের সন্ধান পাওয়া যাক বা না যাক ওরেলানাকে বার দিনের ভেতরে নৌকা নিয়ে ফিরতে হবে।

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে নানা মত আছে। স্পেনের রাজার কাছে লেখা পিৎসারোর চিঠিতে জানা যায় ওরেলানা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলেন। ওরেলানার দলভুক্ত একজন ধর্মযাজক ফ্রায়ার গ্যাসপার ডি কার্ভাহাল অবশ্য অন্য কথা বলেন। তাঁর লেখা এই অভিযানের কাহিনীতে তিনি বলেছেন, ওই খর স্রোতে অতদূর উজান বেয়ে ওরেলানার পক্ষে নৌকা ঘুরিয়ে ফিরে যাবার কোন উপায় ছিল না। আর যত দিনে ওরেলানার দলটি খাবারের সন্ধান পেয়েছিল ততদিন পর্যন্ত পিৎসারোর অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব ছিল না; অন্তত ওরেলানার সেই ধারণাটাই হয়েছিল।

ওরেলানার আমাজন অভিযানের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায় ফ্রায়ার ডি কার্ভাহাল-এর লেখায়। তিনি নদীর নাম রেখে-

ছিলেন ওরেলানা। কীভাবে বদলে গিয়ে সেটা আমাজন হল সে কথা পরে আসছে।

আপাত দৃষ্টিতে ওরেলানার এই অভিযানের পিছনে কোন আবিষ্কারের নেশার চেয়ে অনেক বেশি ছিল প্রয়োজনের তাগিদ। একটানা প্রায় ন' মাস নদীবক্ষে কঠোর জীবন সংগ্রামরত ওরেলানার হয়ত মনেও হয়নি যে তিনি যা করছেন তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। তাছাড়া ফিরে যাবার কোন উপায় নেই এই সত্যটাই তাঁকে ঠেলে দিয়েছে সামনের দিকে। ফ্রায়ার-এর লেখায় সেই সব রোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। নিজেদের এবং সঙ্গীদের জীবন বিপন্ন করে প্রচন্ড স্রোতের মুখে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, ডাঙায় হিংস্র নরখাদক উপজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করা—এই সমস্ত তথ্য কেবল একটি সিদ্ধান্তেই আমাদের পৌঁছে দেয়, তা হল, প্রতিকূল অবস্থায় আত্মরক্ষার জৈবিক তাগিদই তাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফ্রায়ার-এর লেখা থেকে দু একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। ১৫৪২ এর ৮ জানুয়ারী সন্ধ্যায় দূর থেকে নৌকারোহীরা শুনতে পেল অস্পষ্ট মাদলের আওয়াজ। পরদিন সকালে দেখা গেল চারটে ক্যানু ভরতি করে স্থানীয় ইন্ডিয়ানরা তাদেরই লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। শ্বেতাঙ্গদের দেখা মাত্র তড়িৎগতিতে নৌকা ঘুরিয়ে নিয়ে আশেপাশের গ্রামগুলিতে পাঠিয়ে দিল বিপদ সংকেত। ওরেলানার নির্দেশে তাঁর সঙ্গীরা প্রচন্ড শক্তিতে দাঁড় টেনে নিকটস্থ গ্রামে নৌকা ভিড়িয়ে দিল। তবে মজার কথা হল, স্পানিয়ার্ডরা গ্রামের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা তাদের ঘরবাড়ি সব ফেলে যে যেদিকে পারল পালাল। এরপর কয়েকটা দিন ওরেলানার সঙ্গীদের বেশ ভালই কেটেছিল। ইন্ডি-য়ানদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথাবার্তা বলে ওরেলানা বুঝে নিয়েছিলেন যে তাঁদের উপর অত্যাচার না করে ভাল ব্যবহার করলে তাঁর নিজেরই সুবিধা হবে। এর সুফল তিনি হাতে হাতে পেয়েছিলেন। কারণ সেই গ্রাম ছাড়ার পর বেশ অনেকটা পথ তাঁদের

অতিক্রম করতে হয় এক রকম না খেয়ে। জনবিরল অঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহের আশাও ছিল দুরাশা মাত্র। ঠিক এমনি সংকটের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল একদল ইণ্ডিয়ান ; নদীর এক বাঁকের মুখে নৌকা ভর্তি খাবার নিয়ে তারা অপেক্ষা করছিল বিদেশীদের জন্য। তাদেরই সাহায্যে মাত্র পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে ওরেলানার সঙ্গীরা তৈরী করে নিল আর একটা বড় নৌকা।

তবে সব অভিজ্ঞতাই স্প্যানিয়ার্ডদের পক্ষে এত মধুর হয়নি। মে মাসের ১২ তারিখে ওরেলানার নৌকা এসে পেঁছিল ইণ্ডিয়ানদের এক শক্তিশালী অধিপতি মাকিপারোর (Machiparo) এলাকায়। এখানে সারাদিন সারারাত ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বারবার আক্রমণ করে ইণ্ডিরানরা স্প্যানিয়ার্ডদের বেশ বিপদে ফেলে দিয়েছিল। ফ্রায়ার-এর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে ওঠে সে যুদ্ধের বর্ণনা ঃ "প্রায় ছ'মাইল দূর থেকে নৌকায় বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম ইণ্ডিয়ানদের গ্রামগুলো। চড়া রোদে সাদা বাড়িগুলো চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। কিছুদূর যেতেই দেখলাম বিচিত্র রং-এ রাঙা অনেকগুলো রণতরী আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। আরোহীদের বেশভূষা দেখবার মত। নানা জাতের সরীসৃপের চামড়ায় তৈরি ঢাল, বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, মাদলের আওয়াজে আকাশ কাঁপিয়ে ভীষণ মূর্তি ধরে এগিয়ে আসছিল তারা।"

স্প্যানিয়ার্ডরাও তৈরী হল অস্ত্র নিয়ে। ইণ্ডিয়ানদের একটা নৌকা কাছে আসতেই এক সঙ্গে তীর ছুঁড়ল তারা। বহু ইণ্ডিয়ান মারা পড়লেও দেখা গেল অত সহজে হার মানতে প্রস্তুত নয় তারা। কিছুক্ষণ বাদে নতুন উদ্যমে তারা আবার আক্রমণ করল। এর পর অনেকক্ষণ ধরে জলে ও ডাঙ্গায় চলল দুপক্ষের লড়াই। কখনও সশস্ত্র কখনও খালি হাতে। হারজিত যখন অনিশ্চিত তখনই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই রণে ভঙ্গ দিল ইণ্ডিয়ানরা। পঁচিশজন সঙ্গী নিয়ে ওরেলানা ফাঁকা গ্রামটা ঘুরে

খাদ্য সংগ্রহে বার হলেন। তখনই শুরু হল ইন্ডিয়ানদের দ্বিতীয় আক্রমণ। নিমেষে লোকজন, খাবার-দাবার নৌকায় তুলে দিয়ে আবার পাড়ি দিলেন ওরেলানা। ইন্ডিয়ানরা তবু পিছু ছাড়ল না, যুদ্ধ চলল সারারাত এবং তার পরের দিনও। রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে লড়াই করা যায়; কিন্তু মন্ত্রতন্ত্র তুকতাকের বিরুদ্ধে তো অস্ত্র চলে না। ফ্রায়ার লিখেছেন, "ইন্ডিয়ানদের নৌকায় ছিল চার কি পাঁচ জন যাদুকর। বিকট চেহারা তাদের। উদ্ভট সাজ পোষাক। গায়ে বড় বড় সাদা চুনের ফোঁটা। মুখ ভর্তি করে ছাই নিয়ে ফুঁ দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল আমাদের দিকে। আর দু হাতে ধরা চামড় দিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিল মন্ত্রঃপূত জল।" ঝাড়-ফুঁক দিয়ে যখন বিদেশী ভুত তাড়ানো গেলনা, তখন বাধ্য হয়েই ইন্ডিয়ানরা হাল ছেড়ে দিল। এরপর তিনদিন নিরাপদেই কেটে-ছিল স্প্যানিয়ার্ডদের। তাদের বিশ্রামকে আরও মধুর করে তুলে-ছিল চারপাশের চোখ জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য। ভাসতে ভাসতে একটা ছোট গ্রামে এসে নৌকা পারে ঠেকল। খুব সুন্দর জায়গা। ওরেলানা লোকজনদের আদেশ দিলেন গ্রামটি অধিকার করতে। স্থানীয় অধিবাসীরাও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তবে ঘণ্টা খানেকের বেশী তাদের প্রতিরোধ টিঁকল না। সেই গ্রামে পাওয়া গেল প্রচুর খাদ্যদ্রব্য এবং নানা ধরনের তৈজসপত্র, চীনে মাটির বাসন, বড় বড় জার, ছোটখাট পাত্র, মোমদান, ইত্যাদি। আরও কত কি। অপূর্ব রঙীন কারুকার্য করা জিনিসগুলি চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল স্প্যানিয়ার্ডদের। অন্তত ফ্রায়ার কার্ভাহালের লেখা পড়ে তো তাই মনে হয়। নদীতটে সব দৃশ্যই যে মনোহর ছিল তা নয়। কোন এক গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় স্প্যানিয়ার্ডদের চোখে পড়ল এরপর সাতটা ফাঁসিকাঠ; প্রত্যেকটাতে গাঁথা সারসার মানুষের মাথা।

কালক্রমে এসে পড়ল খ্রীষ্টানদের বড় উৎসব, জন দ্য ব্যাপটিস্ট এর দিন। উৎসব পালনের একটা উপযুক্ত বড় জায়গা চাই। খুঁজতে

খুঁজতে নদীর একটা বাঁক ঘুরতেই এক রকম দৈবক্রমেই সবাই এসে পড়লেন সেই বহুশ্রুত আমাজনদের দেশে।

আমাজনদের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আজ হয়ত নেই। কিন্তু পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকের ইউরোপবাসীর কাছে আমাজন নামটা ছিল এল ডোরাডো অথবা স্পাইস দ্বীপপুঞ্জের মতই অদ্ভুত এক রোমাঞ্চের উৎস। এ হল সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রমীলার রাজ্য যার কথা সবাই শুনেছে কিন্তু কেউ দেখে নি। অন্তত শ্বেতাঙ্গ দুনিয়ার কেউ তো নয়ই। প্রাচীন গ্রীক লোককথা অনুযায়ী আমাজনরা হল কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে অবস্থিত সিথিয়ায় বসবাসকারী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এক নারী উপজাতি। রেনেসাঁস-এর প্রভাবে ইউরোপীয় বিদ্বজনেরা যখন থেকে প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি নতুন করে আবিষ্কার করছেন তখন থেকেই আমাজনদের সম্পর্কে তাঁদের এবং সাধারণ মানুষেরও জল্পনার কল্পনার শেষ নেই। তার সঙ্গে ছিল সমসাময়িক ভুপর্যটকদের সাড়া জাগানো ভ্রমণ কাহিনী। ষোড়শ শতকে স্প্যানিশ নাগরিক হিসাবে ওরেলানার মনে আমাজনদের সম্পর্কে কৌতূহল থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। তবে মাত্র ষাট জন লোক নিয়ে খিদের জ্বালায় খাবার খুঁজতে এক নাম না জানা নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়েছেন, এই অবস্থায় আমাজনদের দেশ খুঁজে বার করার কোন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় থাকবার কথা নয়। অতএব কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের পেয়ে বসে সেটা জানা দরকার। অভিযানের প্রথম দিকে কয়েকটি ইণ্ডিয়ান উপজাতির সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডদের বন্ধুত্ব হয়। ইণ্ডিয়ানদের সেই গ্রামে থাকতে একটি ঘটনা প্রথম তাদের আমাজনদের কথা ভাবাতে থাকে। ইণ্ডিয়ানদের সাহায্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওরেলানা তাঁর দ্বিতীয় নৌকাটি নির্মাণ করেছিলেন, পাঠকের অবশ্যই তা মনে আছে। নৌকা তৈরী হলে ইণ্ডিয়ানরা যখন জানল যে বিদেশিরা

আরও পূবে যাবে নদী বেয়ে, তখন তারা বাধা দিল। ওরেলানাকে তারা নানা ভাবে সাবধান করে দিতে লাগল কনিউপুয়েরা (coniu-puyera)-দের সম্বন্ধে। ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় এই কথাটার অর্থ তেজস্বিনী নারী। অমনি বীরাঙ্গণাদের সম্বন্ধে কৌতূহল জেগে উঠল স্প্যানিয়ার্ডদের মনে। তথ্যের অভাবে সে কৌতূহল বেড়ে হল চতুর্গুণ। ইণ্ডিয়ানদের প্রশ্ন করে জানা গেল। ঐ বাহিনী অত্যন্ত হিংস্র স্বভাবের। এবং তাদের হাত থেকে সহজে নিস্তার পাবার নয়। যাই হোক, ইণ্ডিয়ানদের বারণ না মেনেই এগিয়ে চললেন ওরেলানা। কনিউপুয়েরাদের সম্পর্কে আরও নানারকম কাহিনী তাঁদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল। নৌকা নদীর বাঁক ঘুরতেই স্প্যাডিয়ার্ডদের মুখোমুখি পড়ে গেল একদল ইণ্ডিয়ান। তারা বিদেশিদের খবর পেয়ে গিয়েছিল আগেই। কনিউপুয়েরাদের দেশে যাবার উৎসাহ দেখে নানারকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে তারা অতিষ্ঠ করে তুলল ওরেলানার দলকে। তাদের উপহাস সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সেখানেই নেমে পড়লেন ওরেলানা।

এর পরের ঘটনার বিবরণ ফ্রায়ার ডি কার্ভাহাল কিভাবে দিয়েছেন দেখা যাক ঃ "ইণ্ডিয়ানদের তীরের ঘায়ে দেখতে দেখতে আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক লড়াইয়ের পরও ইণ্ডিয়ানদের জনবল অথবা মনোবল কোনটাই কিছুমাত্র কমবার লক্ষণ দেখা গেল না। বরং সময়ের সাথে সাথে যেন আরও দ্বিগুণ হতে লাগল।…জানা গেল এইসব ইণ্ডিয়ানরা আমাজনদের অধীনস্থ করদ রাজ্যের প্রজা। বিদেশীদের আসার খবর পেয়ে প্রজাদের রক্ষা করতে দশ বার জন নারী দেশ এসে যুদ্ধের হাল ধরল। দেখলাম ইণ্ডিয়ান সেনারা তাদের মহিলা সেনাধ্যক্ষদের খুব বাধ্য। তাদের অসম সাহস ও দৈহিক শক্তির সামনে পুরুষরা রীতিমত তটস্থ। কারও সাধ্য ছিলনা লড়াই ছেড়ে পালানো। কারণ তার ফল ছিল মৃত্যু।" আমাজনদের চেহারার বিবরণ দিতে গিয়ে ফ্রায়ার লিখেছেন : "তারা যেমন

লম্বা তেমনি ফর্সা। চেহারায় নেই নারীসুলভ কমনীয়তা। লম্বা চুল বেশী করে মাথার উপর পাকানো। পরনে স্বল্পবাস, হাতে তীর ধনুক নিয়ে এক একজন আমাজন যেন একাই একশ।”

আমাজনদের সম্বন্ধে এর বেশী তথ্য ফ্রায়ার অথবা আর কোন স্প্যানিয়ার্ড-এর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। আমাজনদের সম্পর্কে তিনি পরে আরও তথ্য দিয়েছেন। সেসব কতটা সত্য তা বিচার করা আজকের দিনে অসম্ভব। এসব গল্প ইন্ডিয়ান যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা, অতএব অতিরঞ্জিত। এল ডোরাডোর মত নেহাতই কল্পকাহিনী। স্প্যানিয়ার্ডদের কামিনীকাঞ্চনের প্রতি অহেতুক আসক্তির সুযোগ নিয়েছিল বিচক্ষণ ইন্ডিয়ানরা; সম্ভব অসম্ভব নানা রকম গল্প শুনিয়ে তাদের ঠান্ডা করে রাখার এই পদ্ধতিই তারা বেছে নিয়েছিল। কিন্তু বক্তব্য বিষয় সেটা নয়। আসল কথা হল আমাজনদের সম্বন্ধে এইসব চমকপ্রদ কাহিনী ইউরোপবাসীর মনে এমনই সাড়া জাগিয়েছিল যে ফ্রানসিসকো ওরেলানার স্মরণীয় কীর্তির কথা একরকম চাপাই পড়ে গেল। তার ফল হল এই যে ফ্রায়ার-এর দেওয়া নদীর ওরেলানা নামটা রাতারাতি পাল্টে হয়ে গেল আমাজন, এবং দুঃখের বিষয় এমন একটা সফল অভিযানের অধিনায়ক হয়েও ওরেলানা ধীরে ধীরে মুছে গেলেন তাঁর স্বদেশবাসীর স্মৃতি থেকে।

যাই হোক, আমাজনদের দেশ ছাড়িয়ে ওরেলানা এসে পেঁছলেন আর এক রাজ্যে। বেশ বর্ধিষ্ণু জনপদ; তবে অধিবাসীরা বিদেশী দেখেই আক্রমণ করল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরেলানা সেই জায়গা ছেড়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন। পরের গ্রামে আবার লড়াই বাধল গ্রামবাসীদের সঙ্গে। এবার ওরেলানার এক সঙ্গী আন্তোনিও ডি কারানজা প্রাণ হারালেন বিষাক্ত তীরের ঘায়ে। এর পর থেকে সাবধান হয়ে গেলেন ওরেলানা; ঠিক করলেন খুব প্রয়োজন না হলে তীরে নৌকা লাগাবেন না। অবাশষে, নদীর বুকে অজস্র ছোট ছোট দ্বীপ এবং পাড়ের সমতল জমি দেখে বোঝা

গেল যে নদীর মোহানা আর বেশী দূরে নয়। তারপর জোয়ারের জল যখন নৌকা উজানে টেনে নিয়ে যাবার উপক্রম করল তখন ওরেলানা বুঝলেন যে সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। ছোট দ্বীপগুলির মাঝে সরু খরস্রোতা প্রণালীর ভিতর দিয়ে নৌকা চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়ল। এদিকে দুটো নৌকারই অবস্থা বেশ খারাপ। অগত্যা একটা দ্বীপে দিন পনের কাটাতে বাধ্য হলেন ওরেলানা। নৌকা সারানো হলে ৮ আগষ্ট ১৫৪২ তারিখে আবার শুরু হল যাত্রা। জোয়ারের সময় নোঙর ছাড়া নৌকা ভেসে যায় উজানে। ভারী পাথর দিয়েও আটকে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে এক সময়। দ্বীপবাসী ইন্ডিয়ানরা এই সময় নানা ভাবে স্প্যানিয়ার্ডদের সাহায্য করেছিল। তাদের ব্যবহারে দ্বিগুন উৎসাহিত হয়ে স্প্যানিয়ার্ডরা এগিয়ে চলল মোহানার দিকে। ২৬ আগস্ট নৌকা দুটি সাগরে পড়ল। কিন্তু তাতেই সমস্যার সমাধান হল না। প্রশ্ন হল, এরপর কোন দিকে নৌকা চালান উচিত। এদিকে ওরেলানার কাছে কম্পাস বা দিক নিরূপণ করার অন্য কোন উপায় ছিলনা। সঙ্গীদের নিয়ে তিনি যথার্থই মাঝসমুদ্রে পড়লেন। চারদিকে শুধু জল আর জল, মাটির চিহ্ন কোথাও কিছু নেই।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই অপ্রত্যাশিত এক কান্ড হল, যা এতদিন এত বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও কখনও হয়নি। দুটি নৌকা হঠাৎ আলাদা হয়ে গেল; কখন কেমন করে, ফ্রায়ার-এর লেখা থেকে তা বোঝবার উপায় নেই, তিনি এটুকুই লিখেছেন যে আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে কিউবাগোয়া দ্বীপের নুয়েভে কাদিজ শহরে পৌঁছন পর্যন্ত দুটি নৌকার মধ্যে আর কোন যোগাযোগ হয়নি। এর মাঝে আবার ফ্রায়ার-এর নৌকাটা আটকে গিয়েছিল গালফ অব পাবিয়ার ভিতর। সেখান থেকে বেরোতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। সাত দিন একটানা দাঁড় টেনে অবশেষে তাঁরা নুয়েভে কাদিজ-এ এসে অপর নৌকার নাবিকদের

সঙ্গে মিলিত হলেন। এই পুনর্মিলনের আনন্দ প্রকাশ করবার ভাষা ফ্রায়ার কার্ভাহাল-এর ও ছিল না।

ফ্রান্সিসকো ওরেলানার ঐতিহাসিক অভিযানের কাহিনী এখানেই শেষ। তবে দুরন্ত এ নদীর মোহ তিনি বোধহয় কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আবার ফিরে এসেছিলেন তিনি কয়েক বছর পর আমাজনের মোহানার কাছে একটি উপনিবেশ স্থাপন করতে; এবং সেই সময়ই এক বিষাক্ত তীর বিঁধে নিহত হলেন প্রথম আমাজন বিজয়ী। যদিও প্রথম আমাজন বিজয়ী বলে আজ তাঁকে কেউ জানে না।

তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কার

প্রাচীন মিশরের ফ্যারাও তুতেনখামেনের সমাধি এবং মমি আবিষ্কৃত হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তিন হাজারেরও বেশি বছরের প্রাচীন ঐ সমাধি এবং মমি আবিষ্কারের কাহিনী যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই রোমাঞ্চকর। যে বিশাল পরিমাণ অমূল্য ধন-দৌলত এবং রত্নরাশি সমাধির মধ্যে সঞ্চিত ছিল তা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। পাওয়া গিয়েছিল বিপুল পরিমাণ তাল তাল খাঁটি সোনা—সেই সঙ্গে প্রাচীন মিশরের সুবর্ণ যুগের অতুলনীয় শিল্প-সম্ভারের নানা নিদর্শন।

এই ঐতিহাসিক খননকার্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিশিষ্ট ধনী লর্ড কারনারভন। তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কারের অল্প কিছুদিন পরেই কারনারভনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। নানান দুর্ঘটনার শিকার হন অন্যান্য খননকর্মীরাও। ফলে ছড়িয়ে পড়ে 'তুতেনখামেনের অভিশাপ'-এর নানা অলৌকিক কাহিনী। সব মিলিয়ে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে সুদূর অতীতের ফ্যারাও তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কারের কাহিনী হ'য়ে উঠেছে রহস্য-রোমাঞ্চময়। এটি আর মিশরীয় পুরাতত্ত্ব আর ইতিহাসের অধ্যাপকদের নিরস গবেষণার বিষয় হ'য়ে রইল না—উত্তেজক কাহিনী হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল মানুষের মুখে মুখে।

কিন্তু সে কাহিনী শোনার আগে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে একত্রিশটি শতাব্দী আগের ইতিহাসে—তুতেনখামেন কাহিনীর শুরু যেখানে। শৌর্যে-বীর্যে মিশরের দুটি রাজ্যের তখন সুবর্ণ-যুগ। উত্তরে প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া থেকে দক্ষিণে সুদান পর্যন্ত ছিল সে বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। মিশরীয় সাম্রাজ্যের

এই ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিলাসিতা আর জাঁক-জমক। মিশরীয় শিল্পকলা পেঁছেছিল উৎকর্ষতার চরমে।

তুতেনখামেনের বাবা-মা কারা ছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়না। তৃতীয় আমেনহোটেপ, চতুর্থ আমেনহোটেপ বা আখেনাতেন—এঁদের মধ্যে কোন একজন তুতেনখামেনের পিতা ছিলেন বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। সে যুগে মিশরের রাজপরিবারে ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিয়ের রীতি প্রচলিত ছিল ব'লে প্রাচীন ফ্যারাওদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল জটিল এবং অস্পষ্ট। তুতেনখামেনের মমি আবিষ্কারের পর ১৯২৫ সালে সালে যেসব বিশেষজ্ঞ সেটি পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা আখেনা-তেনের সঙ্গে তুতেনখামেনের চেহারার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করে-ছিলেন। ফলে অনেকে ধারণা করেন আখেনাতেনই ছিলেন তুতেন-খামেনের পিতা কিংবা শ্বশুর। কোন কোন আধুনিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন আখেনাতেন ছিলেন তুতেনখামেনের বড় ভাই।

মিশরীয় ইতিহাসের বিখ্যাত সুন্দরী রানী নেফারতিতি ছিলেন আখেনাতেনের স্ত্রী।

প্রাচীন মিশরীয় ধর্মে বহু দেব-দেবীর মূর্তি পূজা হ'ত। কিন্তু আখেনাতেন একাধিক দেব-মূর্তি পূজার প্রথা বিলোপ করে একমাত্র সূর্যদেবতা আতেন-এর পূজার প্রথা প্রচলিত করেন। ফলে প্রাচীন মিশরীয় সনাতন ধর্মবিশ্বাসে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই ধর্মীয় আলোড়নের মধ্যলগ্নে জন্ম হয় তুতেন-খামেনের। তুতেনখামেন যখন পূর্ণ যুবক মিশর তখন এক ধর্মীয় বিপ্লবের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সনাতনপন্থী পুরোহিতরা আখেনাতেনের এই ধর্মীয় বিপ্লবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন।

কোন কারণে সুন্দরী স্ত্রী নেফারতিতির সঙ্গে আখেনাতেনের মনোমালিন্য হয়—পরিণতিতে বিচ্ছেদ। নিজের জামাতাকে তিনি যুগ্ম শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। এর কিছুদিন পরেই আখেনাতেন এবং তাঁর জামাতা উভয়েরই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু

হয়। মাত্র আট বছর বয়সে নতুন ফ্যারাও হন তুতেনখামেন। সময়কাল আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

আখেনাতেনের রহস্যজনক মৃত্যু এবং তরুণ ফ্যারাও তুতেনখামেনের মিশরের সিংহাসনে আরোহনের পেছনে যে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। উপদেষ্টাদের পরামর্শ অনুসারে তুতেনখামেন শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

সিংহাসনে আরোহণ করে আরও অনেক কাজের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য কাজটি তুতেনখামেন করেছিলেন তা হ'ল আখেনাতেনের একদেবতত্ত্বকে নস্যাৎ করে সনাতন দেব-দেবীদের আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করা। ফলে তরুণ তুতেনখামেন প্রভাবশালী পুরোহিতবর্গের সমর্থন লাভ করেন।

তুতেনখামেন বিয়ে করেন তাঁর চেয়ে বয়সে দু'বছরের বড় সুন্দরী আনখেসেনামানকে। আনখেসেনামান ছিলেন আখেনাতেনের কন্যা। পিতা আখেনাতেন কন্যা আনখেসেনামানকে বিয়েও করেছিলেন। শোনা যায়, তাঁদের নাকি একটি কন্যাসন্তানও হয়েছিল।

তুতেনখামেন অশান্ত মিশর সাম্রাজ্যকে শাসন করেছিলেন প্রার দশ বছর। তিনি ছিলেন মার্জিত রুচির নম্রস্বভাবের যুবক। সাঁতার, কুস্তি এবং শিকারেও তাঁর ঝোঁক ছিল। তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিল খুব সুখের। ১৩৪৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জানুয়ারী মাসে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তুতেনখামেন মারা যান।

ইতিহাসে তুতেনখামেন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেলেও তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে রহস্যাবৃত হয়েই আছে। শুধু যেটুকু জানা যায় তাহ'ল, তুতেনখামেনের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী রাজকার্য চালানোর জন্য এক সাহসী পদক্ষেপ নেন। প্রমাণ পাওয়া গেছে, তিনি হিত্তিতেস-এর রাজার কাছে অনুরোধ করেন কোন এক রাজপুত্রকে তাঁর রাজ্যে পাঠাতে, যাঁকে সঙ্গী করে তিনি রাজ্য চালাতে পারবেন। রানীর অনুরোধে এসেও

ছিলেন এক রাজপুত্র। কিন্তু রাজ্যের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সম্ভবত হোরেমহেব নামে জনৈক সেনাধ্যক্ষ তাঁকে হত্যা করেন। তুতেনখামেনের অকালমৃত্যুর পর হোরেমহেব ক্ষমতা তখল করে নেন। সুতরাং হোরেমহেবই তুতেনখামেনকে হত্যা করে থাকতে পারেন এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

হোরেমহেব ক্ষমতায় এসে সমস্ত মন্দির, স্মৃতিসৌধ এবং সরকারী নথীপত্র থেকে তুতেনখামেনের নাম মুছে ফেলেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমাধিতে হাত দেওয়ার চেষ্টা তিনি কোনদিন করেননি।

জনপ্রিয় তরুণ ফ্যারাও তুতেনখামেনের দেহ সমাহিত করার প্রস্তুতিপর্বের যে কাহিনী শোনা যায় এক কথায় তা অভূতপূর্ব। সত্তর দিন ধরে পুরোহিতরা তাঁর দেহকে মমিতে পরিণত করেন। নাসিকাছিদ্র দিয়ে তাঁর মস্তিষ্ক বার করে নেওয়া হয়েছিল। বার করে নেওয়া হয়েছিল তাঁর আন্তরযন্ত্র বা ভিসেরাও। তারপর দেহ পরিষ্কার করে মুছে নিয়ে হাজার হাজার গজ দীর্ঘ সূক্ষ্ম লিনেন বা ক্ষৌম বস্ত্র দিয়ে ভাল করে জড়ানো হয়। তাতে বেঁধে দেওয়া হয় অসংখ্য অমূল্য সব রত্ন, মন্ত্রপূত কবচ ও আরও নানান পবিত্র জিনিস। দেহে ঢালা হয় পূত বারি। তারপর নানান আচার-অনুষ্ঠান পালন করার পর তাঁর দেহ স্থাপন করা হয় নিরেট সোনার শবাধারে। শবাধারের মাথায় এঁটে দেওয়া হয় পেটাই সোনার তৈরি তুতেনখামেনের একটি চমৎকার মুখোশ। সোনার শবাধারটি এরপর রাখা হয় অন্য আরও দুটি শবাধারের মধ্যে। প্রত্যেকটি শবাধারেই এঁটে দেওয়া হয়েছিল একটি করে তুতেনখামেনের সোনার মুখোশ।

সবশেষে ভূগর্ভের সমাধিক্ষেত্রে একটি চমৎকার কারুকার্যখচিত গ্রানাইট পাথরের বিশাল শবাধারে তুতেনখামেনকে চিরশায়িত করা হয়। পাথরের শবাধারের ওপরে নির্মাণ করা হয় তিনটি মন্দির। সমাধিতে এবং সমাধিসংলগ্ন একটি কক্ষে রাখা হয়

নানানরকম মূল্যবান আসবাবপত্র। এরপর প্রবেশমুখ বন্ধ করে সীল করে দেওয়া হয়। গোপন রহস্যের মায়াময় গভীর অন্ধকার জগতে সুবর্ণ কফিনে শুয়ে শাশ্বতলোকের পথে যাত্রা করলেন তরুণ ফ্যারাও তুতেনখামেন।

যে বিশাল সমারোহ আর জাঁকজমক সহকারে তুতেনখামেনকে সমাহিত করা হ'য়েছিল তা তরুণ ফ্যারাও নিজেও হয়ত কোনদিন কল্পনা করেননি, কল্পনা করেননি যারা তাকে সমাহিত করেছিলেন তারাও। এমনকি, হোরেমহেবের মত যোদ্ধা—যিনি ইতিহাস থেকে তুতেনখামেনের নাম মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন—তিনিও কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি।

এ তো গেল ছায়াচ্ছন্ন সুদূর অতীত ইতিহাসের কাহিনী। এর পরের কাহিনীর শুরু এই শতাব্দীর গোড়াতে। স্থান ঃ জার্মানী, কাল ঃ ১৯০২ খৃষ্টাব্দ আর পাত্র ঃ সম্ভ্রান্ত ধনী আর্ল অব কারনারভন।

একদিন নিজে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন কারনারভন। পথে ঘটল এক দুর্ঘটনা, উল্টোদিক থেকে আসা আর একটি গাড়ীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ। গুরুতর আহত হ'লেন কারনারভন। তাঁর বুকে চোট লেগেছিল। ডাক্তার তাঁকে কোন উষ্ণ শুষ্ক আবহাওয়ায় গিয়ে থাকার পরামর্শ দিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য কারনারভন চলে গেলেন মিশরে।

সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ মিশরে থাকাকালীনই কারনারভনের মিশরী পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহ জন্মায়। গভীর আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তিনি একদিন দেখা করেন মিশরীয় অ্যাণ্টিক বিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেল ডঃ হাওয়ার্ড কার্টারের সঙ্গে। কার্টারও বোধহয় এমনই একজন মানুষের খোঁজ করছিলেন। তুতেনখামেনের সমাধি সম্পর্কে আগ্রহ ছিল তাঁর। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া বহু প্রাচীন এক সমাধির সন্ধানের কাজ ছিল বলা বাহুল্য বিরাট ব্যয় বহুল। কারনারভন রাজি হয়ে গেলেন খনন-

কার্যের ব্যায় বহন করতে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হ'ল ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া এক অধ্যায়ের সন্ধানের বিশাল কর্মকান্ড।

সেকালে প্রায় প্রত্যেকটি ফ্যারাও-এর সমাধি থেকে ডাকাতরা মূল্যবান ধনরত্ন লুঠ করে নিত। তারা বংশপরম্পরায় এই লুঠ-তরাজ চালাত। তুতেনখামেনকে সমাহিত করার মাত্র বছর দশেক কিংবা তার কিছু পরে তাঁর সমাধি ভেঙ্গে কিছু ডাকাত ভেতরে ঢোকে এবং কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। ডাকাতির ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি পুনঃস্থাপন করা হয়। এরপর আর ঐ সমাধিক্ষেত্রের কোন ক্ষতি কেউ করতে পারেননি। সম্ভবত সেখানে নিশ্ছিদ্র পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর দু'শ বছর পরে চতুর্থ রামেসিস তুতেনখামেনের সমাধির সন্ধানে খননকার্য চালান। ফলস্বরূপ টন টন চুনাপাথর কুচির নিচে সমাধিটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়, হারিয়ে যায় ভূগর্ভের অতল অন্ধকারে।

যাইহোক কারনারভন আর কার্টারের যৌথ উদ্যোগে তুতেন-খামেনের সমাধি সন্ধানের কাজ একটানা চলেছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে খননকার্য কিছুদিনের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর আবার কাজ শুরু হয়। বহু মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল ১৯২২ সালের ৪ নভেম্বর। বিশাল ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে অবশেষে সমাধির প্রবেশপথের সন্ধান পাওয়া গেল।

কার্টার শ্রী ও শ্রীমতী কারনারভনকে সঙ্গে নিয়ে ১৬টি ধাপ পর্যন্ত খনন করেন। আবিষ্কৃত হয় মূল কক্ষ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি কক্ষের করিডোর—যেখানে গত তিরিশ শতাব্দী ধরে কোন মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি।

প্রবেশদ্বারে বড় গর্ত করে কার্টার বৈদ্যুতিক টর্চের জোরালো আলো ফেললেন ভেতরে। এক অভূতপূর্ব দৃশ্যে তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তাঁর বিস্ময়বিস্ফারিত চোখের সামনে

থেকে কুয়াশার এক আস্তরণ সরে গিয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল অদ্ভুত বিচিত্র নানা জীবজন্তুর মূর্তি আর রাশীকৃত তাল তাল সোনা ! যেদিকে তাকান শুধু সোনার চোখ ধাঁধানো দ্যুতি। স্বপ্নেও কল্পনা করা যায়না এমন গুপ্তধনের কথা। কার্টারের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'ল, এই রাজকীয় বৈভবের আড়ালেই নিশ্চয়ই শায়িত রয়েছেন ফ্যারাও তুতেনখামেন। অক্ষত অবিকৃত অবস্থায় এমন একটি ভূগর্ভে হারিয়ে যাওয়া সমাধির আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সারা পৃথিবী আলোড়িত হ'য়ে উঠল এই রোমাঞ্চকর সংবাদে। পর্যটক আর সাংবাদিকদের ভিড় সামলানো কঠিন হ'য়ে পড়ল। আবিষ্কৃত কক্ষটি লোহার গেট দিয়ে আটকে সীল করে দেওয়া হ'ল। ব্যবস্থা হ'ল দিনরাত পাহারার।

কার্টারের ভাষায়, আবিষ্কৃত অ্যান্টি চেম্বারের জাঁক-জমক তাঁর মনে এক অদম্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কক্ষটি ছিল প্রায় ২৬ ফুট চওড়া। সেকালের নানা মূল্যবান রাজকীয় আসবাবপত্র, অপূর্ব সুন্দর নানা জিনিসপত্র এবং সূক্ষ্ম শিল্পকলার নানা নিদর্শনে কক্ষটি ঠাসা ছিল।

কিন্তু হাওয়ার্ড কার্টারের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল তুতেনখামেনের সমাধিটি উন্মোচনের সময়। তাঁরা প্রথমে সমাধিকক্ষের মন্দিরগুলির মধ্যে প্রস্তরনির্মীত বিশাল শবাধারটি দেখতে পান। শবাধার উন্মোচনের আগে খুব সতর্কতার সঙ্গে মন্দিরগুলো প্রস্তর শবাধারের ওপর থেকে সরানো হয়।

এদিকে যারা সমাধি খননের কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের ওপর তুতেনখামেনের অভিশাপের নানা কাহিনী রটে যায় সারা বিশ্বে। লর্ড কারনারভন মারা যান ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে। খননের কাজ করার সময় এক বিষাক্ত কীটের দংশনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শোনা যায়, এরপর নাকি ঘটতে থাকে আরও নানা দুর্ঘটনা। কার্টার স্বীকার করেছেন, পবিত্র সমাধির চারদিকে সবসময় যেন ঘুরে

বেড়াত রহস্যময় ভয়ঙ্কর কোন আত্মা। কিন্তু কোন অশরীরি অশুভ শক্তি সেখানে ঘুরে বেড়াতো বা তাদের দ্বারা মিশরীয় পুরাতাত্ত্বিকদের কোন ক্ষতি হয়েছিল একথা তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। প্রাচীন মিশরের পুরোহিতদের অশরীরি অলৌকিক শক্তির কাহিনীগুলিকে কার্টার এক ধরনের মামুলি ভূতের গলপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে মিশরীয় জীবন-যাত্রার আচার-অনুষ্ঠানে এ ধরনের অভিশাপের কোন স্থান নেই। মিশরীয় পুরাতাত্ত্বিকদের এ ধরনের সমাধিক্ষেত্রের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাঁরা কখনই ভীত সন্ত্রস্ত নন। মৃত সম্রাটের পবিত্র সমাধিস্থল 'অপবিত্র' করার মূল নায়ক যিনি সেই হাওয়ার্ড কার্টারের কিন্তু কোনদিন কোন অমঙ্গল বা ক্ষতি হয়নি।

বছরের পর বছর ধরে কার্টার তুতেনখামেনের সমাধিতে খনন-কার্য চালান। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কারুকার্যখচিত বিশাল গ্রানাইট পাথরের শবাধারটির ঢাকনা খোলা হয় বহু সর-কারী অফিসার, বিজ্ঞানী এবং মিশর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পুরাতাত্ত্বিক-দের উপস্থিতিতে। ঢাকনা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নজরে এল কালো শবাচ্ছাদন বস্ত্র দ্বারা কোন একটা কিছু জড়ানো রয়েছে। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে বস্তুটির গা থেকে বস্ত্রখণ্ডটি খুলে নেওয়া হ'তে লাগল। বহু পুরনো হয়ে যাওয়ায় বস্ত্রখণ্ডটি হাত দেওয়া মাত্র টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল। কারও মুখে কোন কথা নেই। উত্তেজনায় বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল সবার। কয়েকজোড়া নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে পরতে পরতে উন্মোচিত হ'তে লাগল তিন হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসের অনাবিষ্কৃত এক অধ্যায়। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে সবাই দেখলেন বস্ত্রখণ্ডে জড়ানো রয়েছে ফ্যারাও তুতেনখামেনের এক বিশাল মূর্তি। খাঁটি সোনায় গড়া। পুরো শবাধার জুড়ে শোয়ানো মূর্তিটির দৈর্ঘ্য সাত ফুট। মূর্তিটি তৈরি হয়েছিল কাঠ খোদাই করে—তার ওপর গলানো সোনা ঢালাই করে দেওয়া হয়েছিল। মূর্তির

কপালে খোদিত ছিল প্রাচীন মিশরীয় সাম্রাজ্যের প্রতীক সাপ ও শকুনের প্রতিমূর্তি। আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত দুটি হাত ছিল মিশরের রাজকীয় প্রতীক।

কিন্তু এই চমৎকার শবাধারটির সমস্ত জাঁকজমকই তুচ্ছ মনে হয় একটি অপূর্ব ছোট্ট ফুলের মালার কাছে—যেটি জড়ানো ছিল মূর্তির কপালে খোদিত প্রতীক দুটির চারধারে। যদিও মালাটি শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল তবুও তখনও যেন রং-এর আভাটুকু লেগেছিল তার গায়ে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, নিশ্চিতভাবে ঐ ফুলের মালাটি দিয়েছিলেন ফ্যারাও-এর তরুণী বধূ আজ থেকে তিন হাজার তিনশ বছর আগে। সমস্ত রাজকীয় জাঁকজমক ও স্বর্ণবৈভবের মধ্যেও ঐ ছোট্ট মালাটি এতই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে মুহূর্তে যেন উপস্থিত মানুষগুলির মনের আবেগ তেত্রিশটি শতাব্দীর মধ্যে একটি সেতু রচনা করে দিল। কার্টারের ভাষায়, আমরা যেন সেই শোকার্ত মৃত মানুষগুলির ভৌতিক পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম।

প্রস্তর শবাধারটির মধ্যে দ্বিতীয় শবাধারটি ছিল। এটিও চমৎকার কারুকার্যখচিত এবং এটির মধ্যে ছিল ফ্যারাও-এর আর একটি মূর্তি। এই দ্বিতীয় শবাটারটির মধ্যেই ছিল নিরেট সোনার তৈরি তৃতীয় শবাধারটি। এই সোনার শবাধারের মধ্যে পাওয়া যায় তুতেনখামেনের মমি। সুবর্ণ শবাধারে খোদাই করা ছিল অপূর্ব কারুকাজ! ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা শবাধারটির সোনার পাতগুলি ছিল আড়াই থেকে সাড়ে তিন মিলিমিটার পুরু। শবাধারটি এত ভারি ছিল যে আটজন লোক লেগেছিল ওটি উঁচু করতে।

তাল তাল নিরেট সোনার তৈরি ঐ শবাধারটির আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক সাড়াজাগানো ঐতিহাসিক ঘটনা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশপরম্পরায় গোরস্থানের ডাকাতরা ঐসব সমাধিতে কেন বারবার ডাকাতির চেষ্টা করে চলেছে তার কারণ খুব সহজেই

অনুমান করা যায়। তুতেনখামেন একজন অতি সাধারণ ছোটখাট ফ্যারাও ছিলেন। বড় বড় বিখ্যাত ফ্যারাওদের সমাধিতে যে কি বিশাল পরিমাণ রত্নভাণ্ডার লুকনো আছে তা কল্পনা করা কঠিন নয়।

তবে তুতেনখামেন কাহিনী ক্লাইমেক্সে পেঁছয় সুবর্ণ শবাধারটির আবরণ উন্মোচন ও তার মমি পরীক্ষা করতে গিয়ে। মমিটি খুবই চমৎকার ভাবে তৈরি করা হয়েছিল। মমির মাথায় ছিল পেটাই সোনার তৈরি সুন্দর একটি মুখোশ। মুখোশটিকে প্রাচীন মিশরের সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি শিল্পের একটি চমৎকার উদাহরণ বলা যেতে পারে। তুতেনখামেনের মমিটি একটি চমৎকার কারুকার্যময় সূক্ষ্ম শবাচ্ছাদন বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। বস্ত্রখণ্ডটি অলংকৃত করা হ'য়েছিল সোনা এবং বহু মূল্যবান রত্নরাজি দিয়ে। কিন্তু শবদেহে মাখানো অনুলেপনের জন্য সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল! সারা দেহে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল দেবতার স্বাগত বাণী সম্বলিত ভারি ভারি সুবর্ণ ফলক। এসব কিছুই শবাধারের তলায় পুত বারি জমিয়ে পিণ্ড পাকিয়ে তা দিয়ে দ্রুত আটকে দেওয়া হয়েছিল। কার্টারের বিশ্বাস, পুরোহিতরা তুতেনখামেনের মরদেহ একেবারে যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯২৬ সালের ১১ নভেম্বর তুতেনখামেনের মমিটি পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন বহু সরকারী অফিসার এবং বৈজ্ঞানিক। হাওয়ার্ড কার্টার এবং মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির অধ্যাপক ডঃ ডগলাস ই ডেরি মমি পরীক্ষার কাজ করেন।

প্রথমে মাথার আচ্ছাদন সরানো হয়। বেরিয়ে আসে তুতেনখামেনের কামানো মাথা এবং পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর অবয়ব—বিশেষতঃ স্পষ্ট রেখাযুক্ত তাঁর ঠোঁট দুটি। যথাযথভাবেই আখেনাতেনের সঙ্গে তুতেনখামেনের মুখের আদলের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মমিটি শবাধারের সঙ্গে এমন দৃঢ় ভাবে আটকানো ছিল যে আচ্ছাদনমুক্ত করার জন্য শবাচ্ছাদন বস্ত্রটি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হয়েছিল। শবাচ্ছাদন বস্ত্রে যে অসংখ্য মূল্যবান রত্নরাজি, কবচ, স্বর্ণনির্মিত পবিত্র নানা বস্তু ও মূল্যবান উজ্জ্বল পাথর পাওয়া গেছে তার সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং শিল্পনৈপুণ্য এখনকার দক্ষ স্বর্ণশিল্পী ও রত্নকারদেরও হার মানায় বলে মন্তব্য করেছেন কার্টার!

তুতেনখামেনের দেহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাঁর নাসিকা-ছিদ্র দিয়ে মস্তিষ্ককে বার করে নেওয়া হয়েছিল এবং তারপর ছিদ্র দুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্বল্প উন্মিলীত চোখের পাতা দুটি ছিল দীর্ঘ। অল্প ফাঁক করা ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছিল। কান দুটি ছিল ছোট কিন্তু সুগঠিত। তলপেট কেটে দেহাভ্যন্তর থেকে ভিসেরা বার করে নেওয়া হয়েছিল এবং সেই শূন্য স্থান ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল লিনেন ও রজন দিয়ে। গোটা দেহটাই ভাল করে কামিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যৌনাঙ্গ আলাদা ভাবে বস্ত্রখন্ড দিয়ে মোড়া ছিল এবং সামনের দিকে টেনে ঋজু করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সুন্নত করা হচ্ছেছিল কিনা তা বলা সম্ভব ছিল না।

তুতেনখামেনের শারীরিক উচ্চতা মাপা হয়েছিল ৫ ফুট ৪½ ইঞ্চি এবং তিনি কিছুটা শীর্ণকায় ছিলেন। তবে মমিতে পরিণত করার ফলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কোষগুলির সংকোচন ঘটে। তাই হিসেব করা হয়েছে ১৩৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি ছিলেন ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা। তাঁর মৃত্যুর কোন কারণ আজ পর্যন্ত জানা যায়নি!

তুতেনখামেনের দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—অন্ত্রাদি আলাদাভাবে সংরক্ষিত দুটি শবাধারে পাওয়া গেছে। ঐ শবাধার দুটিতে দুটি সদ্যোজাত শিশুরও মমি পাওয়া যায়। শিশু দুটি তাঁরই এ অনুমান করা কঠিন নয়!

অনেকে তুতেনখামেনের সমাধিতে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, তুতেনখামেনকে শান্তিতে শায়িত থাকতে দেওয়া হোক। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ একদিকে বিশাল প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞান ও অন্যদিকে একালের ডাকাতদের সম্ভাব্য তৎপরতা সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাঁর সমাধিতে যে অসংখ্য অমূল্য সম্পদ ও রত্নরাজি সঞ্চিত ছিল তা সেকালের ডাকাতদের মত একালের ডাকাতদেরও যে আকর্ষণ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফ্যারাও তুতেনখামেনকে আবার চিরশায়িত করে রাখা হয়েছে এবং সমাধিতে প্রাপ্ত মূল্যবান সম্পদগুলি সংরক্ষিত করা হয়েছে কায়রো মিউজিয়ামে।

নিষিদ্ধ মরুনগরী কুফরা

কুফ্রা ! দুর্ধর্ষ সেনুসি অধ্যুষিত এই মরুশহরটির অবস্থান আফ্রিকার দুর্গম লিবিয়ান মরুভূমির ঠিক মধ্যস্থলে। চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত ধু ধু বালুরাশি, মাঝখানে ছোট্ট এই শহর। সেনুসিদের পবিত্র তীর্থ কুফরা চিরকালই নাস্তিক ও বিধর্মীদের কাছে নিষিদ্ধনগরী। ক্বচিৎ কদাচিৎও বাইরের মানুষের পা পড়েনা এখানে।

শ্রীমতী রোসিটা ফোরবেস এই নিষিদ্ধ নগরীর কথা প্রথম শোনেন ১৯১৯ সালে—আলজিয়ার্সে মরু-অভিযানের সময়। ১৮৭০ সালে গেরহার্ড রোহ্লিস নামে এক দুঃসাহসিক জার্মান অভিযাত্রী সঙ্গীদের নিয়ে জোর করে এই নিষিদ্ধ নগরীতে ঢুকে পড়েছিলেন। সে জার্মান অভিযাত্রী দলের যে মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল সে কাহিনী শোনার পর আর কোন ইউরোপীয় কুফরায় যাওয়ার সাহস করেননি। কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন গেরহার্ড—একা। নৃশংস ভাবে খুন হয়েছিল তার সঙ্গীরা, লুঠ হয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পের জিনিসপত্র।

নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ তীব্রতর। রোসিটারও তাই হয়েছিল। লোকমুখে কুফরার নানান বিচিত্র কাহিনী শুনে রোসিটা ওই দুর্গম শহরটির প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। মনস্থির করে ফেললেন, কুফরা যাবেন। বিপদের কথা ফোরবেসের অজানা ছিল না। কিন্তু আফ্রিকা আর আরব দুনিয়ার মানুষদের প্রতি তার ভালবাসা ছিল নিখাদ। সেই ভালবাসার টানের কাছে সব বিপদই তুচ্ছ।

কুফরা পেঁছিতে হ'লে লিবিয়ান মরুভূমির ওপর দিয়ে প্রায়

৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। শক্তিশালী দুর্ধর্ষ সেনুসিরা এই অঞ্চলে আধিপত্য করে চলেছে এই শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকে। যুদ্ধ করে চলেছে একদিকে ফরাসী অন্যদিকে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে। তাই বিধর্মী ইউরোপীয়ান মাত্রই সেনুসিদের শত্রু। সে কথাও জানতেন ফোরবেস।

রোসিটা ফোরবেস ছিলেন ডিভোসী। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না সুন্দরী তরুণী। প্রকৃত দুঃসাহসী অভিযাত্রী মন ছিল তার। ভয় কাকে বলে জানতেন না।

জলহীন এক বিশাল ধু ধু মরুভূমি। আফ্রিকার দুর্গম এই মরুভূমিতে অভিযাত্রীর পা পড়েনা বললেই চলে। ক্বচিৎ কখনও সেনুসিদের এক আধটা ক্যারাভান ছাড়া জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। রোসিটা স্থির করলেন আরব রমণীর ছদ্মবেশে এই অভিযান করবেন। নিজেকে তৈরিও করে নিলেন সেই মত। আরবী ভাষা শিখে নিলেন, কোরাণ পড়লেন; রপ্ত করে নিলেন ইসলামিক আচার ব্যবহার—যাতে করে তিনি একজন গ্রাম্য রমণীর মত নিখুঁত আচরণ করতে পারেন। রোসিটা ভাল করে শিখে নিলেন, যে কোন পরিস্থিতিতে বা পরিবেশে একজন আরব রমণী কেমন করে ওঠে বসে, ঘুমোয়, খায়, পোষাক পরে। এমনকি রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মধ্যে যদি হেসে ওঠেন বা কেঁদে ওঠেন তাও যেন আরবী ভাষায় করেন, ইংরেজীতে নয়।

নিজেকে মিশরীয় বণিক আবদুল্লা ফাহ্‌মির কন্যা খাদিজা পরিচয় দিয়ে ফোরবেস তাঁর কুফরা অভিযান শুরু করেন। সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন খাদিজা, চলেছেন পবিত্র কুফরায় তীর্থ করতে।

ঐ দুঃসাহসিক অভিযানে রোসিটার সঙ্গী হয়েছিলেন আহ্‌মেদ বে হাসানেইন। হাসানেইন ছিলেন মিশরের রাজা ফুয়াদের রাজ-সরকার। রাজা ফুয়াদের সঙ্গে তিনি ইংলণ্ডেও গিয়েছিলেন এবং সেণ্ট মাইকেল ও সেণ্ট জর্জের নাইট কম্যাণ্ডারও হয়েছিলেন।

সেনুসিরা ছিল ইসলামের সমধর্মী এক যুদ্ধবাজ শক্তিশালী জাতি। অত্যন্ত গোঁড়া এবং রক্ষণশীল সেনুসিরা খ্রীষ্টান এবং তুর্কীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সাহারা মরুভূমির পূর্ব প্রান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পূর্ব সাহারার এই বিশাল মরু-অঞ্চলটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে স্বল্প-বসতিপূর্ণ অঞ্চল। ওয়াদাই, ফেজান-এর মরুভূমি এবং চাদ হ্রদ এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুরে বেড়াত এদের ক্যারভান। সেনুসিরা অস্ত্র এবং ক্রীতদাসের ব্যবসা করত। আরবদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সেনুসিরা আশ্রয় নেয় মরু-ভূমির প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চল কুফরায় এবং সেই সময় থেকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসীদের ঔপনিবেশিক অভিযানের বিরুদ্ধে শুরু করে প্রচন্ড সশস্ত্র প্রতিরোধ। ১৯০০-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ —এই দশ বছর ধরে তারা চাদ হ্রদ থেকে নীল নদের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ফরাসীদের সঙ্গে টানা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ১৯১০-১৯১১—এই সময়কালে সেনুসিরা সিরেনাইকায় লড়াই করে ইতালীয়দের সঙ্গে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তারা মিশরের সীমান্তে ব্রিটিশদের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছে। এই ভাবেই সেনুসিরা এক অপ্রতিরোধ্য দুর্ধর্ষ জাতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

১৯১৮ সালে সিরি মহম্মদ এল ইদ্রিশ সেনুসিদের প্রধান হন। শান্তিপ্রিয় ইদ্রিশ ব্রিটিশ এবং ইতালীয়দের সঙ্গে চুক্তি করেন। চুক্তির ফলে লিবিয়ার ইতালীয়রা উপকূল অঞ্চলের পরে আর তাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেনি। ইদ্রিশের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় সেনুসিদের একচ্ছত্র আধিপত্য। তাই ইদ্রিশের মুখের কথাই ছিল সেনুসিদের কাছে আইন।

ছাড়পত্র ছাড়া বিনা অনুমতিতে কুফরা যাওয়ার ইচ্ছে ছিলনা ফোরবেসের। যাত্রাপথে আগে তারা যান ইতালীতে আমীর ফইজুল-এর কাছে। আমীর ফইজুল ছিলেন সিরিয়ার সিংহাসন-

চ্যুত রাজা। ফরাসীরা তাকে নির্বাসন দিয়েছিল। কিন্তু মক্কার শেরিফ হওয়ায় ইসলামিক দুনিয়ায় ফইজুলের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

ইতালীর মিলানে পেঁছে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল ফোরবেসদের। মুসোলিনী তখন ছিলেন একটি পত্রিকার সম্পাদক। রেল স্টেশনে দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন ফোরবেসরা। দাঙ্গাবিধ্বস্ত রেলস্টেশন থেকে মুসোলিনী তাদের মালপত্র উদ্ধার করে দেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোসিটা মুসোলিনীকে শোনান তাঁর কুফরা অভিযানের পরিকল্পনার কথা।

সুন্দরী তরুণী রোসিটা ফোরবেসের দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা শুনে মুসোলিনী হাসলেন। বললেন, তুমি কোনদিনই কুফরা পেঁছতে পারবে না। বড়জোর অজানা দেশে কিছু নতুন প্রেমিক জুটতে পারে তোমার—ব্যস, ঐ পর্যন্তই।

প্রেম-ভালবাসা তো একটা সাময়িক ব্যাপার এবং সেরকম প্রেম সে একাধিকবার করেছে। ফোরবেস শান্ত ভাবে জবাব দিলেন, কিন্তু এটা মানুষের জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ অভিযানে প্রেমিকের উপস্থিতি অসুবিধার সৃষ্টি করে।

জবাবে মুসোলিনী বলেছিলেন, মানুষের জীবনে প্রেমিকেরও প্রয়োজন আছে। সাহারা মরুভূমি কখনই তোমার জীবনে প্রেমিক পুরুষের ভূমিকা নিতে পারবে না।

লেক কোমের কার্ণোবিওতে আমীর ফইজুল-এর দেখা মিলল। ফোরবেসকে সাদর আপ্যায়ণে স্বাগত জানালেন ফইজুল। খুশি হয়েই তিনি সেনুসি নেতা ইদ্রিশকে চিঠি লিখে ফোরবেসের হাতে দিলেন, এ চিঠি পরে অনেক কাজে লেগেঝিল ফোরবেসের।

ফইজুলের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে ফোরবেস ও হাসানেইন বে রেলপথে চললেন নেপলস্-এ। দুর্ভাগ্যবশত মাঝপথে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে গেল। নিজেরা কোনমতে রক্ষা পেলেও সঙ্গের মালপত্রের

কোন হদিশ পাওয়া গেল না। প্রাক্-মুসোলিনী যুগে ইতালীয় রেলপথে নিরাপত্তা বলে কিছু ছিল না। যেখানে সেখানে ট্রেন থামিয়ে ট্রেনের গার্ডের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় বন্দুক দেখিয়ে যাত্রীদের জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়ার ঘটনাও প্রায়ই ঘটত। আইন-শৃঙ্খলার ধার ধারত না কেউ। মুসোলিনী ক্ষমতায় আসার পর ইতালীতে রেলভ্রমণে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা আসে।

যাইহোক, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তারা তাদের মালপত্র ফিরে পান। এরপর থেকে তারা আর তাদের জিনিসপত্র চোখের আড়াল করেননি। নেপলস্-এর বাকি রাস্তাটুকু তারা তাঁবু ইত্যাদি অন্যান্য মালপত্র নিয়ে ট্রেনের লাগেজ ভ্যানে চড়ে যান।

বেনগাজীতে পৌঁছে তারা সেনুসি নেতা আমীর ইদ্রিশের সঙ্গে দেখা করেন। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর ইদ্রিশ তাদের কুফরায় যাওয়ার ছাড়পত্র দেন। বলতে গেলে বেশ ঝুঁকি নিয়েই ইদ্রিশকে ফোরবেসদের কুফরায় যাওয়ার অনুমতি দিতে হয়েছিল। সেনুসিদের কাছে তাঁর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দিল। তবুও আমীর ইদ্রিশ এবং তার ভাই-এর ফোরবেসদের কুফরার ছাড়পত্র দেওয়াটা একটা রহস্য হয়েই ছিল। তিনটি কারণে ব্যাপারটা এত সহজে হয়ে গিয়েছিল বলে ফোরবেসের মনে হয়েছিল ঃ এক, আমীর ফইজুলের চিঠি ; দুই, হাসানেইন বে-র বাকচাতুর্য এবং অন্যের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষমতা ; তিন, সেনুসি নেতার ইতালীর বিরুদ্ধে ব্রিটেনের ঘনিষ্ঠতা লাভের আকাঙ্খা।

ইতালীয়রা এই কুফরা অভিযানের কথা বিন্দুবিসর্গ জানত না। ফোরবেসও তাঁর অভিযানের পরিকলপনাটা যথাসম্ভব গোপন রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিলেন আমীর ইদ্রিশ। ইতালীর সঙ্গে ইদ্রিশের সম্পর্ক ছিল জোর করে চাপিয়ে দেওয়া একটা শীতল বন্ধুত্বের সম্পর্কের মত।

খুব গোপনে ফোরবেসরা বেনগাজী ত্যাগ করে যান। তাদের আশঙ্কা ছিল ইতালীয়রা যদি টের পায় তাহ'লে হয়ত বেনগাজী

ছেড়ে যেতে তাদের বাধা দিতে পারে।

বেনগাজী থেকে তারা মরুভূমির প্রান্তে জেদাবিয়া নামে এক গ্রামে যান। ঐ গ্রামে থাকতেন ইদ্রিশের ভাই সৈয়দ রিদ্দা। রিদ্দা ফোরবেসদের সঙ্গে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহার করেন। তাদের কুফরা যাত্রার প্রস্তুতির ব্যাপারে গোপনে নানা-রকম সাহায্যও করেন।

রিদ্দা তাদের উটের ব্যবস্থা করে দেন। গাইডদের জন্য দরকারি জিনিসপত্রও জোগাড় করে দেন। সঙ্গে দিয়ে দেন কয়েকটি কৃষ্ণকায় যুদ্ধবাজ ক্রীতদাস, বিপদে আপদে এরাই রক্ষা করবে ফোরবেসদের। রিদ্দার পরামর্শেই ফোরবেসরা গায়ে চড়িয়ে নেন মরুচারী বেদুইনদের পোষাক। ১৯২০ সালের ৮ ডিসেম্বর গভীর রাতে ছদ্মবেশে ফোরবেসরা দলবল নিয়ে জেদা-বিয়া ত্যাগ করেন।

যাত্রা শুরুর এই অতি গোপনীয়তার মধ্যেই নিহীত ছিল বিপদের ইঙ্গিত যা তারা আগে টের পাননি। ধর্মান্ধ গোঁড়া সেনুসিরা কখনই চায়নি বিধর্মী ফোরবেসরা জীবিত অবস্থায় পবিত্র কুফরার মাটিতে পা দেন। তারা চেয়েছিল ফোরবেসরা ভয়ংকর বালির ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, নয়ত জলহীন মরুভূমিতে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরুক। তাতেও যদি তারা অক্ষত থাকেন তাহ'লে ওদের খুন করা হোক। সেইমত পরিকল্পনাও ছ'কে ফেলা হ'ল। ক্যাম্পে ফোরবেসদের সঙ্গেই ছিল বিশ্বাসঘাতক— যার ওপর ভার দেওয়া হ'য়েছিল ফোরবেস ও হাসানেইন বে-কে খুন করার।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত: বেশির ভাগ আরবই ছিল ফোরবেসদের প্রতি বিশ্বস্ত। ওদের সঙ্গে রিদ্দার পাঠানো দুজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্য ছিল—মহম্মদ ও ইউসুফ। ওরা সবসময় ছায়ার মত ফোরবেস আর হাসানেইনকে চোখে চোখে রাখত। আসার সময় রিদ্দা ওদের বলে দিয়েছিলেন, 'তোমাদের বুদ্ধি ও

সতর্ক দৃষ্টির ওপরই নির্ভর করছে এদের নিরাপত্তা।' ওরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল প্রভুর সে নির্দেশ।

জনহীন মরুপ্রান্তর। চারদিকে ধূ ধূ বালুরাশি। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ফোরবেসের দল জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে। চলার গতি এখন ঘণ্টায় মাত্র দু'মাইল। পিঠে মালপত্র নিয়ে বালির পথে উট এর বেশি জোরে চলতে পারেনা।

এভাবে অনেকটা পথ চলে এক সময় ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল ওদের উটগুলি। জলের অভাব—তার ওপর শ্বাসরোধকারী ভয়ঙ্কর বালির ঝড়। টানা হাঁটার ফলে উটগুলির পাগুলো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছিল। চলার গতি মন্থর হয়ে আসছিল। নিদ্রাহীন টানা সতেরো ঘণ্টা পথ চলে অবশেষে তারা জনবসতি দেখতে পেলেন। কিন্তু সেখানেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি তারা। শত্রুভাবাপন্ন বেদুইনরা আক্রমণ করে বসতে পারে যেকোন সময়। বিপদের সম্ভাবনা নিয়েই থামতে হ'ল তাদের, কারণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

মরুপথে হাঁটার সময়ই তারা টের পেয়ে গিয়েছিলেন দলের বিশ্বাসঘাতকটির কথা। স্বয়ং গাইড আবদুল্লাই ছিল সেই বিশ্বাস ঘাতক। আবদুল্লার মনের অভিসন্ধি ধরে ফেলেছিলেন ফোর-বেসরা। যে কোন সময় সে তাদের হত্যার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ফোরবেস বা হাসানেইন সেকথা আবদুল্লাকে বুঝতে দেননি। শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা কতটা ঠিক হবে একথাই ভাবছিলেন তারা। একবার ভাবলেনও আবদুল্লা তাদের খুন করার আগে তারাই আবদুল্লাকে গোপনে খুন করে ফেলবে। কিন্তু নিজেদের জীবনরক্ষার জন্য অপরের জীবন হানি কি সঙ্গত? নির্জন মরুপ্রান্তরে আবদুল্লার মত বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করলে কেউ তাদের দোষ দিতনা। মহম্মদের হাত নিশপিস করছিল। সামান্য ইঙ্গিতেই সে সাঙ্গ করে দেবে বিশ্বাস-ঘাতক আবদুল্লার ভবলীলা। কিন্তু তারা আবদুল্লাকে বাঁচিয়ে

রাখলেন। এগিয়ে চললেন ওর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে।

এভাবেই মরুভূমির দীর্ঘ পথ তারা অতিক্রম করে গেলেন। সঙ্গের ম্যাপ অনুযায়ী জানুয়ারী মাসের গোড়াতেই তাদের কুফরা পেঁাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু যেখানে পেঁাছলেন সেখানে জানমানবের চিহ্ন মাত্র নেই ; চারদিকে শুধু ধূসর রং-এর বালি আর বালি। তেমনই অসহ্য গরম। সঙ্গের জলও ফুরিয়ে আসছিল। উটগুলো জল না খেয়ে রয়েছে প্রায় ১১ দিন, সবুজ ঘাসপাতা দাঁতে কাটেনি এক মাস। এক নিশ্চিত বিপদের আতঙ্ক ক্রমশ গ্রাস করতে লাগল তাদের। আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জলের সন্ধান না পেলে মৃত্যু অনিবার্য। পাত্রের শেষ তলানীটুকু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। ক্লান্ত পদক্ষেপে শরীটাকে কোন-ক্রমে টেনে হিচড়ে নিয়ে চললেন তারা সামনের দিকে। কেউ কারুর সঙ্গে কথাও বলছিলেন না। ক্ষত-বিক্ষত পা দিয়ে ঝরে পড়ছিল রক্ত আর পুঁজ।

আরও বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর তারা এসে পেঁাছলেন এল আতাশ এ। এল আতাশ এর অর্থ 'তৃষ্ণা'। জায়গাটা বেশ নিচু। কিন্তু এখানেও জলের কোন চিহ্ন নেই। এখানে এসে তারা যে দৃশ্য দেখলেন তাতে আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল সবার মুখ। ইতস্তত ছড়িয়ে ছটিয়ে রয়েছে কোন মৃত ক্যারাভানের হাড়গোড়। সম্ভবত মরুভূমিতে পথ হারিয়ে তারা এখানে চলে এসেছিল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে মরা মানুষ আর উটের কঙ্কাল।

শেষ পরিণতির ব্যাপারে সবাই যখন নিশ্চিত ঠিক তখনই ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত চারদিক অন্ধকার করে ঢেকে ফেলল ঘন কুয়াশার আস্তরণ। এক ঝলক আর্দ্র ঠাণ্ডা বাতাস তাদের মুমূর্ষু দেহগুলোকে শীতল করে দিল। সাময়িক উপশম হ'ল তৃষ্ণার। অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে আপাতরক্ষা পাওয়া গেল। কিন্তু বাঁচতে হ'লে জল চাই। কুফরা আর কতদূরে কে জানে ?

ফোরবেস হতোদ্যম মনোবলহীন দলের লোকজনদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন। সঙ্গের গাইডরা ও জানেনা তারা কোথায় এসে পেঁছেছে। ফোরবেস নিজের কম্পাসটা দেখিয়ে বললেন, কম্পাস অনুযায়ী আমরা কুফরার খুব কাছাকাছি পেঁাছে গেছি, মরূদ্যান আর বেশি দূরে নয়। ফোরবেসের প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি আর দৃঢ় মনোবলে কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল দলের লোকজন।

পরদিন সত্যি সত্যিই তারা সন্ধান পেলেন জলের। বিবর্ণ নোনা জল। সেই জল পান করেই প্রাণ বাঁচালেন তারা।

একটু চাঙ্গা হ'য়ে আবার এগিয়ে চললেন। এবার চারদিকে বিরাট বিরাট বালিয়াড়ি। এমনি একটা বালিয়াড়ি পেরোতেই চোখে পড়ল একটা পুরো ক্যারাভানের মৃতদেহ। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে কিছুদিন আগেই। ফোরবেসের লেখা থেকে জানা যায়, তাদের দেহের সাদা পশমের পোষাকগুলো তখনও পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় ছিল। হাড়ের গায়ে লেগেছিল অল্প অল্প মাংস ; শুকিয়ে হলুদ হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে শেষ হ'ল দীর্ঘ পথচলা। ১৪ জানুয়ারী তারা কুফরায় পেঁছলেন। এক মনোরম সবুজ মরু উপত্যকা। চার দিক ঘিরে রেখেছে রঙীন পাহাড় আর নীল জলের হ্রদ। হ্রদের পাড়ে পাম গাছের সারি।

উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত সেনুসিদের পবিত্র স্থান তাজ। আর উপত্যকার বৃহত্তম হ্রদটির অপর পারে সেনুসি জনপদ জোফ শহর।

বিনা বাধাতেই ফোরবেসরা তাজ-এ পেঁছে গেলেন। সেখানে আমীর ইদ্রিশের চিঠি দেখাতে সাদর অভ্যর্থনা পেলেন। কিন্তু তাজ থেকে উপত্যকা শহর জোফ-এ নেমে আসতেই সেনুসি উপজাতিদের বাধার সম্মুখীন হলেন তারা। শত্রুভাবাপন্ন সেনু-সিরা তাদের কয়েকবার হত্যার চেষ্টাও করল।

এদিকে বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লাও সুযোগ খুঁজতে লাগল।

জোফের শাসনকর্তা কাইমাকানের সঙ্গে গোপনে দেখা করল সে। কাইমাকানকে আবদুল্লা বলল, রোসিটা ফোরবেস আর হাসানেইন বে আসলে খ্রীষ্টান, তারা মুসলমানের ছদ্মবেশে ইতালীর গুপ্তচর হয়ে কুফরায় এসেছে। উদ্দেশ্য কুফরা দখল করে নেওয়া।

কিন্তু আবদুল্লার কথা বিশ্বাস করতে চাইলেননা কাইমাকান। বললেন, ওদের কাছে তো আমীর ও তাঁর ভাই-এর চিঠি রয়েছে।

আবদুল্লাও হাল ছাড়লনা। বলল, ফোরবেসরা কৌশলে আমীর ও তার ভাই-এর মন ভুলিয়ে চিঠি লিখিয়ে এনেছে। আরও বলল, কুফরা যাত্রার শুরু থেকেই তারা গোপনে ম্যাপ তৈরি করেছে। উটের পায়ে লাগিয়ে দিয়েছিল এক ধরনের বিশেষ যন্ত্র (ঘড়ি)। আর ওই মহিলা (ফোরবেস) ও সব সময় নিজের হাতে ঝুলিয়ে রেখেছিল এক ঘড়ি (আসলে ওটা ছিল ফোরবেসের নিজস্ব কম্পাস)।

ফোরবেসরা তাঁবুর ওপরে একটা ব্যারোমিটার ঝুলিয়ে রাখত। আবদুল্লা বলল, আসলে ওটা একটা বিশেষ ধরনের অস্ত্র, কেউ কাছে এলেই ওটা দিয়ে তাকে মারার জন্য ওই অস্ত্রটা ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। ওদের চোখে এমন চশমা ছিল যা দিয়ে অনেক দূরের দেশকেও বড় করে দেখা যায়।

কাইমাকান আবদুল্লার সব কথা শুনেও তাদের চরম দণ্ড দিলেন না। যে পথে তারা এসেছিলেন সেই পথেই ফোরবেসদের ফিরে যেতে বললেন।

কিন্তু কাইমাকানের নির্দেশ পছন্দ হ'লনা আবদুল্লার। কারণ বিশ্বাসঘাতকতা করার পর আর তার আমীরের মুখোমুখি হওয়ার সাহস ছিলনা। ফেরার পথে ওদের খুন করার ছক অন্য ভাবে আঁটতে লাগল।

ফোরবেস আর হাসানেইন বে তাজ-এ দশ দিন ছিলেন। এক সেনুসি গুরুভাই-এর বাড়িতে আরব অতিথি হিসেবে তারা নিরাপদেই কাটিয়ে দিলেন ওই কটা দিন। ওই সময়ই তারা

আবদুল্লার নতুন ষড়যন্ত্রের কথা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তারা জানতে পারলেন, ধর্মান্ধ গোঁড়া সেনুসিদের সঙ্গে আবদুল্লা আবার ষড়যন্ত্র করেছে—তারা যখন উত্তরের দিকে বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে এগোবেন তখনই তাদের খুন করা হবে। বালিয়াড়ির আড়ালে যখন তখন অদৃশ্য হয়ে যায় ক্যারাভানগুলি, তাদের দেহাবশেষ-গুলোও খুঁজে পাওয়া যায়না।

আবদুল্লার ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে ফোরবেসরাও তাদের পরিকল্পনা বদলে ফেললেন। নির্দিষ্ট যাত্রাপথ বদলে তারা ঠিক করলেন মিশরের দিকে চলে যাবেন। যাতে লিবিয়ার মরুভূমিতে তাদের পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া না যায়। গভীর রাতের অন্ধকারে তারা তাজ থেকে যাত্রা শুরু করলেন। শুরু হ'ল আবার মৃত্যুর থাবা থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। এবার তাদের দলের সদস্য সংখ্যা ছয়। ফোরবেস, হাসানেইন বে, দুই বিশ্বস্ত বেদুইন ভৃত্য—মহম্মদ ও ইউসুফ, তাজ কর্তৃপক্ষের দেওয়া আরও একজন অভিজ্ঞ গাইড এবং একজন ছাত্র। ছাত্রটি ওদের সঙ্গে জাঘাবাব পর্যন্ত যাবে।

এবারের যাত্রাপথ ছিল আরও দুর্গম, ভয়ংকর। ধু ধু মরু-প্রান্তরে কয়েকশ মাইলের মধ্যে কোন পানীয় জলের কূপ নেই। ফলে কোন সেনুসি উপজাতি বা ক্যারাভানেরও দেখা মেলেনা সে পথে।

কিছুদূর এগোবার পর তারা টের পেলেন একদল সশস্ত্র সেনুসি উপজাতি তাদের কিছু নিয়েছে, অপেক্ষা করছে সুযোগের। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই ফোরবেসরা বালিয়াড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। সারারাত জেগে বসে রইলেন রাইফেল উঁচিয়ে। অনেক তল্লাসি চালিয়েও উপজাতিরা তাদের সন্ধান পেলনা। ভোরের আলো ফুটে উঠতে তারা হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল।

আবার শুরু হ'ল বিরামহীন পথচলা। দিনে রাতে প্রায়

সতেরো ঘণ্টা করে হেঁটে বারো দিনের মাথায় তারা এসে পেঁাছলেন একটা কূপের কাছে। অবশেষে ১০ ফেব্রুয়ারী ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত অবস্থায় এসে পেঁাছলেন জাঘাবাব-এ। এই স্থানটিও সেনুসিদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। এখানেও ফোরবেসরা সাদর অভ্যর্থনা পেলেন। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে তারা পা বাড়ালেন মিশরের পথে।

পথে ঘটল একটা দুর্ঘটনা। উটের ওপর দাঁড়িয়ে বালুস্তূপের ওপর দিয়ে দূরের দৃশ্য দেখতে গিয়ে পড়ে গেলেন হাসানেইন বে। তার কণ্ঠার হাড় ভেঙ্গে গেল। ফোরবেস প্রাথমিক চিকিৎসা জানতেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বে-র ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিয়ে কাঁধে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। মরফিয়া ইঞ্জেকসনও করে দিলেন।

আহত বে-কে উটের পিঠে বসিয়ে আবার যাত্রা শুরু হ'ল। কিন্তু উটের অসমান পিঠে বসে থেকে ঝাঁকুনিতে জোড়া লাগানো হাড়ের মুখে বার বার ঠোকাঠুকি লাগছিল। অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছিলেন বে। ক্রমশ তার অবস্থার অবনতি হতে লাগল। কিন্তু থামার উপায় নেই, এগিয়ে যেতেই হবে।

এমন সময় একদল মরুসেনা হঠাৎই আবিষ্কার করল ফোরবেস ও তাদের দলকে। ফোরবেসদের খোঁজেই বেরিয়েছিল সেনাদলটি। তারা অসুস্থ হাসানেইন বে এবং ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ফোরবেস ও তার সঙ্গীদের উদ্ধার করে নিয়ে গেল।

শেষ হ'ল রোসিটা ফোরবেসের ভয়ঙ্কর কুফরা অভিযান। তাঁর ঘটনাবহুল অভিযাত্রী জীবনে তিনি অনেক অভিযান করেছেন, কিন্তু কুফরা অভিযানের মত কোনটাই এত উত্তেজনাময় ও রোমাঞ্চকর ছিল না। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে রোসিটা ফোর-বেসের জীবনাবসান ঘটে।

শয়তানের দ্বীপে

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগের কথা। ১৫৪৫ খৃীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। ফ্রান্স-এর রাজা তখন প্রথম ফ্রান্সিস। আটলাণ্টিক-এর বুকে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বেয়ে একটি ফরাসী জাহাজ চলেছে কানাডার দিকে। পরিস্কার নীল আকাশের নীচে দিগন্ত বিস্তৃত মহাসমুদ্রের শান্ত গম্ভীর রূপ। মাঝে মাঝে সামুদ্রিক পাখীর চীৎকার। সব মিলিয়ে এক অপার্থিব পরিবেশ।

উপরের ডেকে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। জাহাজ নিউফাউন্ড-ল্যান্ড দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়েছে। সহসা পশ্চিম আকাশে দিগন্তের কাছে একটা কালো ধোঁয়ার রেখা দেখে ক্যাপ্টেন চমকে উঠলেন। দূরবীন চোখে লাগিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝলেন, ওদিকের কোন দ্বীপে কেউ আগুন জ্বালিয়ে সংকেত পাঠাচ্ছে সাহায্যের প্রত্যাশায়। চকিতে তাঁর মনে ফিরে এল তিন বছর আগেকার এক স্মৃতি। সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদের আদেশ দিলেন তিনি ওই দ্বীপে জাহাজ ভিড়াতে।

ওই শয়তানের দ্বীপে নামতে হবে? ওখানে তো থাকে মৃত মানুষের আত্মারা। কোন জাহাজ পারতপক্ষে ওই দ্বীপের ধারে কাছে ঘেঁষেনা। কয়েকজন নাবিক আপত্তি জানাল।

'তবে শোন', ক্যাপ্টেন বললেন, 'তিন বছর আগের কথা। রাজার আদেশে সিনিওর দ্য রবেরভাল কানাডার প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হলেন। সেন্ট মালো দ্বীপ থেকে অটাওয়ার পথে পাড়ি দিলেন সেণ্ট এলিজাবেথ জাহাজে চেপে। সেটা ১৫৪২-এর এপ্রিল। আমি তখন জাহাজে সামান্য এক অফিসারের পদে। গ্রান্ড

সিনিওরের সঙ্গে তাঁর পরমাসুন্দরী ভাইঝি মার্গেরিট। তিনি নিজে ছিলেন বিপত্নীক ও অপুত্রক। তাঁর অবর্তমানে তাঁর সব সম্পত্তির উত্তরাধিকার মার্গেরিটের। দেখে মনে হত ভাইঝিকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন সিনিওর দ্য রবেরভাল। তাই তো প্রায় ভিরমি খেয়ে গেলাম সেই দিন—আমি একা নই, এক জাহাজ ভর্তি লোক—যেদিন তিনি ভাইঝিকে ওই শয়তানের দ্বীপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসার আদেশ দিলেন। ক্রমে একটু একটু করে এর পিছনের কাহিনী সব জানতে পারলাম।

'খুব বড় ঘরে মার্গেরিটের বিয়ে দেবার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন সিনিওর দ্য রবেরভাল। এদিকে মেয়েটি মন দিয়ে বসল এক কপর্দকশূন্য অশ্বারোহী সৈনিককে। তাকেই বিয়ে করবে এই ধনুর্ভঙ্গ পণ করে। কাকা যে তা কখনই হতে দেবেন না তা খুব ভাল করে জেনেও। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিনিওরের কন্যাসমা ভাইঝির দিকে হাত বাড়াবার পরিণাম কি জেনেও সেই যুবক—নাম তার পিরের—উঠে পড়েছিল ওই জাহাজেই। মার্গে-রিটের সঙ্গলাভের আশায় সে চলেছিল সুদূর কানাডার ফরাসী উপনিবেশে যোগ দিতে।

'শুরুতে এই গোপন প্রেমের একমাত্র সাক্ষী জাহাজে ছিল মার্গেরিটের বুড়ি নার্স ক্যাথরিন। রাতের অন্ধকারে জাহাজের পিছন দিকে এক কোণে মার্গেরিট ও পীয়ের যখন মিলিত হত, তখন ক্যাথরিন পাহারা দিত। এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। এর মধ্যে কখন সবার অলক্ষ্যে এক জোড়া কৌতূহলী চোখ তাদের পিছু নিল। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা আঁচ করে সেই চোখের মালিক তা যথাস্থানে জানিয়ে দিল, যদিও অন্ধকারে পিয়েরের মুখ সে দেখতে পায়নি, নামও জানতে পারেনি। অমনি অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত ক্রোধে উন্মত্ত সিনিওরের আদেশ এল মার্গেরিটের উপর—কে তার প্রেমিক, নাম বলতে হবে। না বললে তাকে ফেলে আসা হবে দ্বীপে। ক্যাথারিন কেঁদে লুটিয়ে পড়ল। মার্গেরিট

সব স্বীকার করল, কিন্তু দৃঢ়চিত্তে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন। আমি ওকে ভালবাসি, ওকেই বিয়ে করব। কিন্তু ওর নাম কিছুতেই বলতে পারব না। গ্রান্ড সিনিওর রবেরভাল-এর ভাইঝি ও উত্তরাধিকারী বিয়ে করবে এক পথের ভিখিরিকে ? ক্রূর হাসি হেসে সিনিওর বললেন, তোমার ভালবাসা কতটা গভীর একবার দেখে নিই। এক নাম গোত্রহীন ছোকরার হাতে ভাইঝিকে তুলে দিয়ে বংশের মুখে চুনকালি দিতে হবে ? দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ভাইঝিকে জাহাজের পোর্টহোলের কাছে নিয়ে গিয়ে দূরে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখিয়ে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছ ? ওই জায়গাটাকে বলা হয় শয়তানের দ্বীপ, প্রেতাত্মাদের আস্তানা ওটা। ওখানে কোন মানুষ থাকতে পারেনা। আমার কথার অবাধ্য হলে ওই দ্বীপে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে জাহাজ চলে যাবে। মৃত্যু পর্যন্ত ওখানেই থাকবে একা। এবার ভেবে দেখ। ওর নাম বলবে ?' হৃদয়হীন সিনিওরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মার্গেরিট বলল, 'না। আমাকে ক্ষমা করুন।' নাম বলে দেওয়া মানেই পিয়েরের মৃত্যু এটা সে জানত।

'তখন কথা না বাড়িয়ে সিনিওর আদেশ দিলেন। জাহাজ থেকে একটা নৌকায় তোলা হোল মার্গেরিটকে। সামান্য কিছু খাবার সঙ্গে দেওয়া হল। নৌকা ছাড়বার আগে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল ক্যাথরিন। বলল, আমিও যাব, আমাকেও নৌকোয় তুলে দিন। কী জানি সিনিওরের মনে কি হল, বললেন, ঠিক আছে।

'মার্গেরিট ও ক্যাথরিনকে শয়তানের দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে নৌকা ফিরে এল। নৌকা ছাড়বার আগে মাঝিরা কাঁদতে কাঁদতে মার্গেরিটের হাতে একটা ছুরি ও সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি তুলে দিল। ইচ্ছা থাকলেও ওর চেয়ে বেশি কিছু দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধীরে ধীরে নৌকাটি এগিয়ে গিয়ে জাহাজের গায়ে লাগল, এক দৃষ্টে মার্গেরিট ও ক্যাথরিন তাকিয়ে রইল জাহাজের দিকে। তাদের মৃত্যুর মুখে রেখে জাহাজটি আস্তে আস্তে

ছেড়ে দিল। শুধু পাথর আর পাহাড়, আর হাড় কাঁপানো শীতে ওখানে মৃত্যু অবধারিত। সব জাহাজ ওই দ্বীপটি এড়িয়ে চলে।

'সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ফেলে আসা দুটি প্রাণীকে ডেক থেকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। সেন্ট এলিজাবেথ যখন দ্বীপটার পাথুরে বেলাভূমি পিছনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ডেক থেকে এক অলপ বয়সী যাত্রী ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। পিঠে বাঁধা তার বন্দুক আর কার্তুজের বাক্স। দ্রুত সাঁতার কেটে সে চলল ওই দ্বীপ লক্ষ্য করে। বলে দিতে হবে না এই সেই পিয়ের যাকে বাঁচাতে মৃত্যুর দ্বীপে নির্বাসন বরণ করে নিয়েছিল মার্গেরিট। সিনিওর চেয়েছিলেন নৌকা নামিয়ে পিয়েরকে ধরে আনার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে পিছপা হতে হল প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে।

তিনজনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি অন্ততঃ একজন বেঁচে আছে, যে আগুনটি জ্বালিয়েছে। কিন্তু কে সে? না কি তিনজনই বেঁচে?'

এই পর্যন্ত বলে ক্যাপ্টেন থামলেন। এর পর আর কেউ আপত্তি করেনি দ্বীপে যেতে। যথাসময়ে জাহাজ এসে পড়ল দ্বীপের কাছাকাছি। একটা নৌকা নামিয়ে তাতে চড়ে বসলেন ক্যাপ্টেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন। চারদিকে শুধু বালি আর পাথর। না আছে গাছ না আছে কিছু। মানুষের বাসের একেবারে অযোগ্য। নৌকা থেকে নেমে কিছুদূর যেতেই দেখলেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে এক নারী মূর্তি। বহু কষ্টে তিনি চিনলেন মার্গেরিট দ্য রবেরভালকে। দেহে সেই সৌন্দর্যের লেশ মাত্র অবশিষ্ট নেই। পরনে শতছিন্ন বাস। নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে একটানা তিন বছর লড়াই করে সে যে বেঁচে আছে এটাই ক্যাপ্টেন যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে। শেষে মুখ খুললেন মার্গেরিট। 'আপনি তো সেন্ট এলিজাবেথ

জাহাজে অফিসার ছিলেন, তাই না? আপনার চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি তাই চিনতে পারলাম। কিন্তু আমাকে চিনতে পারার কথা নয় আপনার, চিনতে পেরেছেন কি?' কথাগুলো উপহাসের মত শোনালেও মেয়েটির চোখে মুখে কোন ক্ষোভের চিহ্নমাত্র ছিল না। নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন ক্যাপ্টেন। কোথা থেকে একরাশ লজ্জা এসে তাঁকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। অনেক কষ্টে তিনি বললেন, 'আমাদের সত্যি কিছু করবার ছিলনা। সিনিওর দ্য রবেরভাল…'

'আমি জানি,' বাধা দিয়ে বলে উঠল মার্গেরিট। 'আপনাদের কোন দোষ নেই।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আপনাকে কয়েকটা জিনিস দেখাব। যদি আপত্তি না থাকে আমার সঙ্গে আসুন।

মার্গেরিটের সঙ্গে খানিক দূর গিয়ে ক্যাপ্টেন এলেন একটা খোলা জায়গায় এক ছোট্ট কুঁড়েঘরের সামনে। 'এইখানে আমরা থাকতাম, আস্তে আস্তে বলল মার্গেরিট।

'থাকতাম?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন তাকালেন মার্গেরিটের দিকে। 'অর্থাৎ—'

'হাঁ, ঠিকই ধরেছেন,' শান্ত গলায় উত্তর দিল মার্গেরিট। 'আসুন এদিকে।'

কুঁড়েঘরটা পিছনে ফেলে আরো কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্গেরিট। বিস্ময়ে হতবাক ক্যাপ্টেন দেখলেন মাটিতে গাঁথা তিনটি ছোট ছোট ক্রস। হাঁটু গেড়ে সেখানে বসে পড়ে বাঁদিকের ক্রসটার নীচে মাটিতে হাত রেখে খানিকটা যেন আপন মনেই বলে চলে মার্গেরিট।

'এইখানে শুয়ে আমার পিয়ের। ঘুমোচ্ছে। ওর ঘুম আর কোনদিন ভাঙবেনা। কিন্তু এই তো সেদিন—কতদিন আর হবে—রোজ জাহাজের ডেকে ওর সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করতাম গভীর রাত্রে। কেউ জানতে পারত না। একমাত্র ক্যাথরিন ছাড়া। ও পাহারায় থাকত যে। কতবার পিয়ের দেখা করতে চেয়েছে কাকার

সঙ্গে। বলত আমি তোমার কাকার মত করাব—তোমার পানি প্রার্থনা করব। পানি প্রার্থনা—'

হাসি কান্নার মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার হল মার্গেরিটের গলা দিয়ে। তারপর হঠাৎ ক্যাপ্টেনের দিকে চোখ তুলে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি দিইনি ওকে কাকার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করলে ও বিয়ের কথা বলতই, আর সঙ্গে সঙ্গে ওইখানেই হত ওর শেষ। কিন্তু দেখা না করেই বা কি হল? বাঁচাতে পারলাম ওকে?' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মার্গেরিট। একটু শান্ত হয়ে আবার বলল, 'কিন্তু বিয়ে আমাদের হয়েছিল। বিশ্বাস করুন। ভগবানকে সাক্ষী করে, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে। আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করেছিল ক্যাথরিন। নাইবা হল তা প্রথাগত বিয়ে। কিন্তু কোন প্রথাগত বিয়ের স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা আমাদের মত খাঁটি, নিঃস্বার্থ বলতে পারেন? আমাদের একটি সন্তান হয়েছিল। আমাদের ভালবাসার একমাত্র চিহ্ন। সেও নেই। ক্যাথরিনও নেই। সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল—পিয়ের, ক্যাথরিন, আমার বাচ্ছা—' আর বলতে পারলনা মার্গেরিট। বজ্রাহতের মত পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন সেণ্ট এলিজাবেথের ভূতপূর্ব অফিসার।

অনেকক্ষণ পর মার্গেরিট আবার বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে এই ক' বছর আমার কি ভাবে কেটেছে জানতে? আমি সব বলব। আমাকে বলতেই হবে। জানেন গত দেড় বছর আমি কোন কথা বলিনি নিজের সঙ্গে ছাড়া। বলব কার সঙ্গে? কোন মানুষের মুখ দেখিনি এই অভিশপ্ত দ্বীপে। কিন্তু দয়া করে আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না...।' দুহাতে মুখ ঢাকল মার্গেরিট।

জাহাজে উঠে আবার মার্গেরিট বলতে শুরু করল শয়তানের দ্বীপে তার অভিজ্ঞতার কথা। 'প্রথম প্রথম খুব ভয় পেতাম অশরীরী আত্মাদের রক্ত হিম করা বিকট আওয়াজ শুনে। পরে বুঝেছিলাম প্রেতাত্মাদের চীৎকার নয়, ওসব আঁকাবাঁকা পাথুরে

সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে অনর্গল বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ—' (এখানে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার প্রতি কৃপাসূচক ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়লেন ক্যাপটেন)—'আমাদের দিন চলতই না বলা চলে। খাবার জোটানো যে কি কঠিন এই দ্বীপে তা বলার নয়। সামান্য যা কিছু সঙ্গে ছিল দুদিনেই শেষ হয়ে যায়। পিয়ের পাখি মেরে আনত। আমি কোন মতে কাঠকুটো জড়ো রাখতাম শীতের জন্য। মাঝে মধ্যে মাছও ধরতাম। সেন্ট এলিজাবেথের কয়েকজন নাবিক দয়া পরবশ হয়ে আমাদের কয়েকটা যন্ত্রপাতি দিয়ে দিয়েছিল। সেগুলির সাহায্যে ওই কুঁড়ে ঘরটা তৈরি করেছিলাম আমরা। বিয়াল্লিশ-এর শীতটা পড়েছিল সাংঘাতিক। তিনটি মাস ওই কুঁড়ে ঘরের মধ্যে আগুনের চারপাশে জড়োসড়ো হয়ে কাটিয়েছি। এদিকে বাইরে বরফের পাহাড় জমেছে। আমার শৈশব কেটেছিল বিলাসে। তাই বলে সহ্যশক্তি আমার কিছু কম ছিল না। তার জোরেই সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলাম।'

কিছুক্ষণ দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল মার্গেরিট, আমরা যখন বিয়ে করব ঠিক করলাম তখন ক্যাথরিনকে রাজি করাবার প্রশ্ন এসেছিল। রাজি হবে কি হবেনা সে প্রশ্নটি গৌণ নয়। তবে রাজি করানো গিয়েছিল এটাই হল বড় কথা। বিয়ে হয়েও গেল, যদিও প্রথাসিদ্ধ নয়। কিন্তু এখন আর তাতে কিছু এসে যায়না। তারপর একসময় সেই প্রচণ্ড শীতও কেটে গেল। এল বসন্তের উষ্ণতা। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার গর্ভে এল সন্তান। আনন্দে আত্ম-হারা হতে গিয়েও কি একটা অজানা ভয়ে ভেতরটা আমার কেঁপে উঠল। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশের অভিশাপ মাথায় নিয়ে আসছে আরও একটি প্রাণ! 'সেই বছরের গ্রীষ্মে আমার সন্তানের জন্ম হল।'

ক্যাপ্টেন দেখলেন মার্গেরিটের মুখে আস্তে আস্তে আঁধার ঘনিয়ে আসছে। এর পরের ঘটনা বলতে যে তার জিভ আর সরছে না তা তিনি বুঝতে পারলেন। নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

'আমার কাহিনীর আর বিশেষ কিছু বাকী নেই, অস্বাভাবিক ঠান্ডা গলায় বলল মার্গেরিট। 'পিয়ের-এর স্বাস্থ্য আগে থেকেই ভাঙতে শুরু করেছিল। এক সময় ও ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমি সব কিছু ভুলে গিয়ে ওর সেবা করে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম। বাঁচাতে পারিনি। ওর শেষকৃত্য আমিই করেছি।' হাত দুটো শক্ত করে মুঠো পাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল মার্গেরিট।

'পিয়ের মারা যাবার এক বছরের মধ্যে আমার সন্তান, এবং তার পরই ক্যাথরিন—দুজনেই আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তাদেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেছি আমিই নিজে হাতে।'

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'সেই ঘটনার পর—যে দিন তিনি তোমাকে শয়তানের দ্বীপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন—সিনিওর দ্য রবেরভাল-এর বাকী জীবনটা খুব সুখে কাটেনি। কানাডায় উপনিবেশ গড়ার কাজে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে। সকলের অবিমিশ্র ঘৃণাই ছিল তাঁর প্রাপ্য। আর তাইই পেয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত কোনঠাসা হয়ে নিজের বাড়ীতে একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেহরক্ষা করতে হয় তাঁকে।'

কথাগুলো মার্গেরিটের কানে গেল কিনা বোঝা গেলনা। ক্যাপ্টেন দেখলেন ফেলে আসা দ্বীপটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মার্গেরিট। ধীরে ধীরে, এক সময়ে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল সেই দুঃস্বপ্নময় শয়তানের দ্বীপ।

ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে মার্গেরিট তার কাকার সব সম্পত্তির অধিকার পেয়েছিল। ক্রমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে দ্বিতীয় বার বিয়েও করেছিল। কিন্তু তার দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল তার নিজের। একার। ওই সময়টিতে তার মন ফিরে যেত জনমানবশূন্য সেই শয়তানের দ্বীপটিতে। যাকে সে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ভোলেনি। ১৫৪২ থেকে ১৫৪৫—এই তিন বছরের স্মৃতি তার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক অদৃশ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

অতল সমুদ্রের অভিযাত্রী

সে প্রায় দু' দশক আগের কথা। কলকাতার দুই দামাল ছেলে পিনাকী আর ডিউক। তারা ঠিক করলো 'কনোজি আংরে' নামে ছোট একটা ডিঙি নৌকা চেপে পাড়ি দেবে সুদূর আন্দামানে। এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের সেই সমুদ্র অভিযানের সাফল্য আজও ইতিহাস হয়ে আছে। পর্বত অভিযানের মতই রোমাঞ্চকর ছিল সেই জলযাত্রা।

অবশ্য পিনাকী আর ডিউক অতল সমুদ্রের প্রথম অভিযাত্রী নন। আজ থেকে প্রায় ৮৪ বছর আগে মিঃ স্লোকাম নামে এক মার্কিন ভদ্রলোক ৩৭ ফিট লম্বা একটা ডিঙি নৌকো চেপে বেরিয়ে পড়েছিলেন বিশ্ব-পরিক্রমায়। তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিলো আমেরিকার বোস্টন বন্দর থেকে। স্লোকাম ছিলেন বাণিজ্যতরীর অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন। কাজ থেকে ছুটি পাবার পর তিনি বেরিয়ে পড়লেন বিশ্ব-পরিক্রমায়। সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে তাঁর সময় লেগেছিলো প্রায় তিন বছর।

স্লোকামের এই কৃতিত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে ২৪ জন নাবিক বিশ্ব পরিক্রমা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় বৃটেনের স্যার ফ্রান্সিস্ চিসেস্টার ও আমেরিকার এ্যালান এডির অভিযান। চিসেস্টার একটি ডিঙি নৌকো চেপে অতল দরিয়ায় যাত্রা শুরু করেছিলেন। ২৭৫ দিন বাদে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে। এই দীর্ঘ জলযাত্রায় মাত্র একবার বন্দরের মুখ দেখেছেন তিনি। প্রবীণ চিসেস্টারের এই একক দুঃসাহসী অভিযান বৃটেনের আবালবৃদ্ধবণিতার মনে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে-ছিলো তা আজও ভোলবার নয়। দেশে ফেরার পর তিনি লাভ

করেছেন রাজকীয় অভ্যর্থনা।

নিউইয়র্কের এ্যালান এডি সাড়ে পাঁচ বছর ধরে বিশ্ব-পরিক্রমার পর স্বদেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর বাহনের নাম “এ্যাপোজি”। ফাইবার গ্লাসের তৈরী ৩০ ফুট লম্বা এই নৌকোটি তিনি কিনেছিলেন আঠারো হাজার ডলার দিয়ে। আজ থেকে ২৭ বছর আগে তাঁর মাথায় প্রথম এই বিশ্ব-পরিক্রমার চিন্তা উদয় হয়। তখন এডির বয়স মাত্র ৩১ বছর। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজ খুলে দেখলেন তাতে ছাপা হয়েছে ফাইবার গ্লাসে তৈরী এক অভিনব নৌকোর বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল ইচ্ছে করলে আপনিও এই তরী চেপে সাগর পাড়ি দিতে পারেন। সেটা দেখেই এডি বিশ্ব-পরিক্রমার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। অভিযানের তোড়জোড় করতে কেটে গেল এক বছর। তারপর শুরু হল যাত্রা। ৩৯,০০০ মাইল পথ পার হয়ে পৃথিবীর ৪০০ বন্দর ছুঁয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন এ্যালান এডি। তাঁর এই অভিযানের তুলনা নেই। দীর্ঘ পথের অনেকটাই তাঁকে একা চলতে হয়েছে। শেষের দিকে এক মহিলাকে পেয়েছিলেন সহযাত্রীরূপে। এডির দেওয়া বিবরণ থেকে জানা গেছে শত শত তরুণ বৃদ্ধ-কিশোর-কিশোরী তাঁরই মতো বিশ্ব-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছে। তাদের অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে তাঁর।

অবশ্য নৌকায় চেপে সাগর পাড়ি দেবার বহু নজির থাকলেও কাঠের ভেলায় চেপে সাগর পার হবার দৃষ্টান্ত আছে একটাই। আজ সেই দুঃসাহসী কন্টিকি (CON-TIKI) অভিযানের কাহিনী শোনাবো। আজ থেকে প্রায় ৪২ বছর আগে কয়েকটি নওরেজিয়ান তরুণ একটা বিশেষ থিয়োরী প্রমাণ করবার জন্যে ভেলায় চেপে পাড়ি দিয়েছিলো প্রশান্ত মহাসাগরে। সেই অভিযান আজও স্মরণীয় হয়ে আছে সমস্ত তরুণের মনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নওরেজীয়ান এয়ার ফোর্সের তরুণ কর্মী থর হেয়ারধাল (THOR HEYER-

DAHL) এলেন মার্কিন দেশে। যুদ্ধের কাজেই এসেছিলেন তিনি। সেদেশে থাকবার কোন পরিকল্পনা ছিল না তাঁর। কিন্তু হঠাৎ খবর এলো হিটলার আত্মসমর্পণ করেছেন। ফলে হেয়ারধাল আটকে পড়লেন আমেরিকায়। সৈন্যদল থেকেও ছাঁটাই হয়ে গেলেন তিনি। দেশে ফিরবেন, তেমন রসদ নেই কাছে। এদিকে রুজি-রোজগারও বন্ধ। সে এক মহা সমস্যা! অগত্যা, তাঁকে গিয়ে উঠতে হ'ল নওরেজিয়ান সেলার্স হোমে। সেখানে অল্প পয়সায় আহার-বাসস্থানের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেই সেলার্স হোমের ছোট্ট ঘরে নানা চিন্তা এসে ভিড় করলো হেয়ারধালের মাথায়! এমন কি যৌবনে যে স্বপ্নটা তাঁকে একান্ত ভাবে পেয়ে বসেছিল সেটাও নতুন করে দেখতে শুরু করলেন তিনি। ভেলায় চেপে সাগর পাড়ি দেবার স্বপ্ন। তবেই প্রমাণিত হবে তাঁর থিয়োরী। সেখানে বসেই একান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় বন্ধুদের সাহায্যে কনটিকি অভিযানের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু আরম্ভেরও একটা আরম্ভ আছে। যেমন প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো। তাই হেয়ারধালের 'স্বপ্ন' সম্বন্ধে আগেই দু'চার কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

পৃথিবীর মানচিত্র খুলে বসলে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দেখতে পাওয়া যাবে ছোট ছোট কয়েকটি বিন্দু। ভূগোলের বই-এ যার পোশাকী নাম মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জ। সেই দ্বীপের সব কটিতেই পলিনেশীর উপজাতিদের বাস। বিচিত্র তাদের ভাষা, ধর্ম আর সংস্কৃতি। নৃতত্ত্ব ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্র থর হেয়ারধাল একবার গিয়েছিলেন সেই দ্বীপপুঞ্জে। তখন তিনি সবে মাত্র বিবাহ করেছেন। সঙ্গে আছেন তার স্ত্রী। দুটিতে গিয়েছিলেন সেই নির্জন দ্বীপমালায় মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে। একদিন সন্ধ্যায় বসে আছেন সমুদ্রের ধারে। ঢেউ-এর ওঠা নামা দেখতে দেখতে হঠাৎ হেয়ারধালের মনে উদয় হ'ল এক অভিনব চিন্তার। এই দ্বীপের অধিবাসীদের আকৃতি ও ভাষার সঙ্গে কি

অদ্ভুত মিল পেরু অঞ্চলের মানুষের। অথচ কোথায় দক্ষিণ আমেরিকা আর কোথায় মারকুইসাস্ দ্বীপপুঞ্জ। মাঝখানে উত্তাল প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান। তবে কি প্রাচীন কালে আমেরিকার ইন্‌কারা (INCA) ভেলায় চেপে এসে হাজির হয়েছিল এই দ্বীপ-পুঞ্জে? এটা কি বিশ্বাস্য? এও কি সম্ভব?

দ্বীপের বৃদ্ধ মোড়লকে জিজ্ঞেস করায় সেও জবাব দিল হেঁয়ালির ভাষায়। কুল দেবতা টিকির (TIKI) থেকেই নাকি এই দ্বীপবাসীদের উৎপত্তি। সুদূর অতীতে সাগর পারের সূর্য নগরী থেকে টিকি তাঁর দলবল নিয়ে এসেছিলেন এই দ্বীপপুঞ্জে। আজও দ্বীপের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে টিকির প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। লতা ঝোপের আড়ালে সেই কুল দেবতার বিশাল দু চারটে মূর্তিও হয়তো চোখে পড়বে। মোড়লের কথা মত সেই ভাঙা মন্দির ও মূর্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন হেয়ারধাল। খোঁজাখুঁজির পর তার সন্ধান পাওয়া গেল। এই মূর্তিগুলো তিনি যত দেখেন ততই আশ্চর্য হন। ইনকা সভ্যতার ভগ্নাবশেষের সঙ্গে এগুলোর কি আশ্চর্য সাদৃশ্য! এমন মূর্তি তো তিনি আগেই দেখে এসেছেন দক্ষিণ আমেরিকায়। অথচ পেরু (ইন্‌কা সভ্যতার পীঠস্থান) আর মারকুইসাস (Marquesas Islands) দ্বীপমালার মধ্যে অতল জলরাশি। হাজার মাইলের ব্যবধান।

এতকাল পলিনেশীয়দের না মেলানো গেছে মোঙ্গলয়েড অধি-বাসীদের সঙ্গে, না ফেলা গেছে আর্যদের দলে। তাদের উৎপত্তি আর আদি বাসস্থান নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিতর্কের অন্ত নেই। হেয়ারধালের মন বল্লে এই বার সে রহেস্যের, সে বিতর্কের সমাধান হয়ে গেল বুঝি! দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে একটু খোঁজ করলেই হয়তো পলিনেশীয় সভ্যতার হারানো সূত্র সহজেই মিলে যাবে।

আগেই বলেছি, মারকুইসাস দ্বীপমালা গড়ে উঠেছে অনেক-গুলো ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে। একটি দ্বীপের থেকে আর একটি

দ্বীপের ব্যবধানও কম নয়। কখনো একশো মাইল—কি তারও বেশী। জলপথে যোগাযোগের ব্যবস্থাও নেই ভালোরকম। অথচ দূরে দূরে, ছড়িয়ে থাকা পারস্পরিক সম্পর্কহীন দ্বীপগুলির মানুষের ভাষা, আচার আচারণে নেই খুব একটা তফাত। বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরে হেয়ারধালের মনে হল একই উৎস থেকে এই ভাষা ও সংস্কৃতির উৎপত্তি। হয়তো কালক্রমে লোকমুখে ঘুরতে ঘুরতে ভাষার বাইরের রূপ কিছুটা বদলে গেছে। বিভিন্ন দ্বীপের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন রকম। তবু ভেতরের মিলটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একদা একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ নিশ্চয়ই এসে বসতি স্থাপন করেছিলো এই দ্বীপপুঞ্জে। তারা যে ভাষার কথা বলতো সেটাই এদের আদি ভাষা। তাদের লুপ্ত সভ্যতার পরিচয় আজও ছড়িয়ে রয়েছে মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জে। কিন্তু কোথা থেকে এসেছিলো এই অভিযাত্রীরা? অস্ট্রেলিয়া থেকে? না, তার কোন প্রমাণ নেই। তবে কি এশিয়া থেকে? না, এশিয়ার উপকূলও এখান থেকে বহু বহু দূর। ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ মিলিয়ে পেরুর ইনকাদের সঙ্গেই বরং এদের আত্মীয়তা খুঁজে পেলেন হেয়ারধাল। কিন্তু সুধীজনকে এই আবিষ্কারের বৃত্তান্ত জানাবার আগেই বেধে গেল দ্বিতীয় মহাসমর। চারিদিকে বেজে উঠলো যুদ্ধের রণ দামামা। হেয়ারধালকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হল নিজের দেশে। তিনি যোগ দিলেন বিমান বাহিনীতে। কিন্তু বেশীদিন দেশে থাকাও সম্ভব হল না। হিট্‌লারের কাছে হার মানতে হলো নরওয়ের অধিবাসীদের। হেয়ারধাল চলে এলেন আমেরিকায়। এর পরের ঘটনা তো আগেই বলেছি।

সেলার্স হোমের নির্জন ছোট ঘরে বসে হেয়ারধাল ঠিক করলেন তিনিও ইনকাদের মতো ভেলায় চেপে গিয়ে হাজির হবেন মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জে। এই ভাবে সাগর পাড়ি দিতে পারলে তবেই প্রমাণিত হবে তাঁর ধারণা। নানা লোকের নানা উপহাসের উপযুক্ত জবাব দিতে পারবেন তিনি।

মধ্যযুগে ইউরোপের মানুষ জলপথে পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছেছিল আমেরিকায়, এক নতুন পৃথিবীতে। সুতরাং হেয়ারধালের মনে হলো অন্ততঃ আমেরিকার অধিবাসীরা তাঁর এই পরিকল্পনাকে হেসে উড়িয়ে দেবে না। এদের কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য পেলে সম্ভব হবে তাঁর অভিযান। তাই নানা স্তরের মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন হেয়ারধাল।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে খুব একটা সাড়া না পেলেও উত্তর আমেরিকার এ্যাড্ভেঞ্চারপ্রিয় মানুষেরা হেয়ারধালের পরিকল্পনা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলো। অবশ্য মার্কিন নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা পলিনেশিয়দের উৎপত্তি সম্পর্কে এই থিয়োরীকে আমলই দিতে চাইলেন না। ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া তাঁদের কাছে মনে হলো একান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাছাড়া দূরত্বটাও কম নয়। হাজার মাইলেরও বেশী। না, এ অসম্ভব। কিন্তু হেয়ারধালকে কিছুতেই টলানো গেল না। তিনি গোঁ ধরলেন—"যাবোই আমি যাবোই, আমি সমুদ্রেতে যাবোই।"

ইনকারা যে বিশেষ ধরনের ভেলায় চেপে সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো সেগুলো সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলেন তিনি। পেরু ও ইকোয়েডার অঞ্চলে বালসা নামে এক ধরনের হালকা অথচ টেকসই কাঠের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রাচীন কালে ইন্কো-রা নাকি এই বালসা গাছ দিয়েই ভেলা বানাতো।

শুধু ভেলা তৈরীর কলা-কৌশল নয়, আরও নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হ'ল হেয়ারধালের। প্রশান্ত মহাসাগরের একটি মানচিত্র সংগ্রহ করলেন তিনি। তারপর জোয়ার-ভাঁটার সময় ও স্থায়িত্ব, বিভিন্ন সমুদ্রস্রোতের গতিপথ ইত্যাদি তথ্যগুলিও সংগ্রহ করা হল। তারপর পেরুর উপকূল থেকে টুয়ামোটো (TUAMOTO) দ্বীপ পর্যন্ত একটি কাল্পনিক রেখা টানলেন হেয়ারধাল। এটাই হবে তাঁর সম্ভাব্য যাত্রাপথ। টুয়ামোটো দ্বীপে পৌঁছতে কতদিন সময় লাগবে সেটাও হিসেব কষে বার করলেন হেয়ারধাল। ৯০

দিন নয় ১০০ দিনও নয়। ভেলায় করে ভাসতে ভাসতে তিনি পেঁছে যাবেন ৯৭ দিনের মধ্যে।

(২)

হেয়ারধালের এই অভিনব অভিযানের পরিকল্পনা এর আগেই নানা মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ; তবু মজা দেখার জন্যে দু'চার জন উৎসাহ দিতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু তাঁর এই সাতানব্বই দিনের হিসেব শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেল। লোকটার নির্ঘাত মাথা খারাপ! কাঠের ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেবার চেষ্টা—এটাই যথেষ্ট পাগলামি, এর মধ্যেই রয়েছে কত অনিশ্চয়তা, কত রকমের বিপদ। স্রোতের টানে, ঝড়ের ঝাপটায় ভেলা কোথায় ভেসে যাবে তার ঠিক নেই। আর লোকটা বলে কিনা ঠিক সাতানব্বই দিনে পেঁছে যাবে টুয়ামোটো দ্বীপপুঞ্জে! হ্যাঁ, অন্য পারেই যাবে বটে—তবে সেটা হবে পরপার! জলে ডুবেই প্রাণটা যাবে শেষ পর্যন্ত!

হেয়ারধাল কিন্তু এ সব বাজে কথায় কান দিলেন না। কান দেবার সময়ই বা কোথায়? বিভিন্ন সমুদ্র-স্রোতের গতিপথ, জোয়ার ভাঁটার সময় ও স্থায়িত্ব, ডুবো পাহাড়ের অস্তিত্ব, ঘূর্ণি স্রোতের অবস্থান—কত কিছুর খবর নিতে হবে তাঁকে। তাঁর হাতে এখন বিস্তর কাজ। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করতে লাগলেন সেই সব খবর। তারপর সে সমস্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্রের ওপর একটা আঁকাবাঁকা দাগ টানলেন তিনি। এই ভাবে নির্ধারিত হল চার হাজার মাইল অভিযানের পথ।

এরপর সঙ্গী নির্বাচনের পালা। এই দুঃসাহসী অভিযানে পাঁচজন সঙ্গীও জুটে গেল। পাঁচটি উৎসাহী, স্বাস্থ্যবান স্কাণ্ডি-নেভীয় তরুণ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিউইয়র্কে এসেছিল তারা। হেয়ারধালের পরিকল্পনা মনে ধরলো তাদের। তাই, দ্বিধা না করে তারা যোগ দিল এই অভিযানে। অবশ্য প্রার্থীর

যে একেবারে অভাব ছিল তা' নয় ! খবরের কাগজে এই অভিযানের জল্পনা-কল্পনার কথা পড়ে এ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয় বেশ কিছু বালক বালিকাই প্রতিদিন জ্বালাতন করতে শুরু করেছিল হেয়ারধালকে। কিন্তু এ অভিযান তো আর ছেলেখেলা নয়—রীতিমত সাগরের সঙ্গে সংগ্রাম। তাই সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করলেন তিনি।

কিন্তু তখনো আসল কাজ বাকি। নৃতাত্ত্বিক ও নৌ বিশারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরী করতে হবে ইনকা ভেলার নকশা ; তার-পর সেই নকশা দেখেই গড়া হবে তাঁদের জলযানটি।

এই সুযোগে ইনকাদের সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা সেরে রাখি। আজ থেকে প্রায় আট শ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে (প্রায় ৬৫০,০০০ বর্গ মাইল) গড়ে উঠেছিল ইনকা রাজের সাম্রাজ্য। পেরুর কুজকো-তে (Cuzco) ছিল তাঁদের রাজ-ধানী। 'ইনকা' শব্দটি আসলে বিভিন্ন রাজার উপাধি। তার থেকেই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের নাম হয়েছে ইনকা-ইনডিয়ান। নানা ভাষা ও বিচিত্র সংস্কৃতির সম্মেলন ঘটেছিল এই ইনকা সাম্রাজ্যে। কারণ প্রথম দিকে রাজারা প্রায় সকলেই ছিলেন উদার মতাবলম্বী ও সুশাসক। ইনকাদের স্বর্ণ ভাণ্ডার ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্বিদিকে। রাজা হুআয়না কপকের (Huayana Capac) রাজত্ব কালে (১৪৯৩ খৃীঃ থেকে ১৫২৭ খৃীঃ) সেই খ্যাতি গিয়ে পৌঁছালো সাগর পারে। স্বর্ণ-সন্ধানী স্পেনীয় দস্যু ও অভি-যাত্রীরা দলে দলে আসতে সুরু করলো সেই দেশে। তাদের সঙ্গে বেধে গেল ইনকা-রাজের বিরোধ। শেষ পর্যন্ত কপকের ছেলে আতাহুয়ালপা পরাজিত হলেন স্পেনীয় বীর পিৎজারোর হাতে। এর পরের ইতিহাস বড়ই করুণ। স্বর্ণ-সন্ধানী স্পেনীয়ার্ডদের হাতে লুণ্ঠিত হ'ল ইনকাদের শিল্প ভাণ্ডার। নির্বিচার হত্যার ফলে লুপ্ত হ'ল ইনকা বংশ। ইমারত, স্মৃতি-মন্দির সব কিছু ভেঙে পুড়িয়ে তারা চালালো উন্মাদ স্বর্ণ সন্ধান। এইভাবে ধীরে

ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেল ইনকা সভ্যতা।

এই অবলুপ্ত ইনকা-সভ্যতার গৌরবের কথা বলতে গিয়ে কুন (Coon) লিখেছেন—পেরুতে…পিৎজারো যখন প্রথম আসেন তখন সেখানে ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা শুরু হয়ে গেছে। ইনকা সাম্রাজ্যের কারিগরেরা তামা ও টিনের পরিমিত মিশ্রণে ছুরি, কুড়ুল, বাটালি করতেও শিখেছে।…উষ্ট্র জাতীয় দুটি প্রাণী, লামা ও আলপাকাকে তারা পোষ মানিয়েছিল। এগুলো ওদের বোঝা টানতো; পশম, সার ও মাংস সরবরাহ করতো। তারা গিনিপিগও পুষতো। সারা মালভূমির এদিক থেকে ওদিক, এবং উপকূল ভাগেও তারা রোমানদের মত চমৎকার বহু রাজপথ নির্মাণ করে-ছিল।…গভীর খাদের ওপর তারা ঝুলন্ত দাড়ির সেতু প্রস্তুত করেছিল। ইনকা সাম্রাজ্যের কর্মচারীরা এই সব পথ দিয়ে শান্তি রক্ষা করতে কর আদায় করতে এবং মালপত্র প্রভৃতির যথাযথ চলাচলের ব্যবস্থা করতে যাতায়াত, করতো।…উপকূল ভাগের বহু নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনো খুঁড়ে দেখা হয়নি। এসব নগরে ইনডিয়ানরা (ইনকা) সারি সারি তাঁত চালাতো। …উপকূলের জলহীন সমতলভূমিতে হাজার হাজার কবরে পশম ও কার্পাস বস্ত্রের যে নমুনা পাওয়া গেছে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ বস্ত্রের সঙ্গে তা তুলনীয়।"—(C. S. Coon : Story of Man)। এই ইনকা-সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন পারসিক সভ্যতার তুলনা করলে হয়তো কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। রণকুশলতার অভাবেই ঐ দুটি সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লো। এটাই সবচেয়ে দুঃখের কথা।

কিন্তু ইনকাদের কথা আর নয়; পূর্ব-প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাওয়া যাক। হেয়ারধারের পরিকল্পনা মত ইতঃমধ্যে কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তীরে এসে বুঝি তরী ডোবে। অভিযান পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাবেন হেয়ারধাল। তাই নানা প্রতিষ্ঠানের

কাছে চাঁদার জন্যে আবেদন করলেন তিনি। তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে অনেকেই এগিয়ে এলেন। সাড়া মিললো বহু জায়গা থেকে। এছাড়া অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির তালিকাও তৈরী করা দরকার। সঙ্গীদের সঙ্গে বসে সেই তালিকা তৈরী করতেই কেটে গেল বেশ কয়েক দিন। কারণ এই অভিযানের পক্ষে কোনটা দরকারী আর কোনটা অপ্রয়োজনীয় সেটা স্থির করা সহজ নয়। বেশি জিনিস-পত্র নেওয়াও মুশকিল। কোন মতেই ভার বাড়ানো চলবে না। ভার বাড়ালেই ভরাডুবি।

এরপর ভেলা তৈরী। নৃতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে পাওয়া নকশা অনুযায়ী ভেলা তৈরী করতে শাল-সেগুনের মত কোন ভারী কাঠ ব্যবহার করা চলবে না। দক্ষিণ আমেরিকার ইকোরডার অঞ্চলে আছে কর্ক-জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য। চলতি ভাষায় যার নাম বালসা কাঠ, শোলার মতই হালকা—অথচ বেশ মজবুত ও টেঁকসই। সেই কাঠ দিয়েই তৈরী হ'ত ইনকাদের ভেলা। নদীর ধারেই বাসলা গাছের ফলন হয় ভালো। সেখান থেকে গাছ কেটে ফেলা হ'ত নদীর জলে। তারপর সেগুলো এক সঙ্গে বেঁধে তারা ভাসিয়ে নিয়ে যেতো মোহনার দিকে। তারপর যথাস্থানে পেঁছে তারা জল থেকে তুলে ফেলতো সেই কাঠের স্তূপ। হেয়ারধাল ঠিক করলেন এই পদ্ধতিতেই তৈরী হবে তাঁদের ভেলা।

সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বিমানযোগে গিয়ে হাজির হলেন দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডোরে। কিন্তু কাগজে-কলমে যতটা সহজ মনে হয়েছিল কার্যকালে দেখা গেল ব্যাপারটা তত সহজ নয়।

প্রথমতঃ, বালসা গাছ জোগাড় করাই কঠিন। এছাড়া দীর্ঘ গুঁড়ি প্রায় দুষ্প্রাপ্য। কারণ এই গাছগুলো খুব একটা উঁচু হয় না। প্রাথমিক চেষ্টায় যেগুলো সংগৃহীত হল সেগুলো নিতান্তই ছোট; তা' দিয়ে খুব একটা কাজ হবে না। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর বারোটা মোটামুটি দীর্ঘ বালসা গাছের সন্ধান

পেলেন তাঁরা। এরপর এই গাছগুলো কেটে সেই কাঠের স্তূপ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে পেরুর সুপ্রাচীন ক্যাল্লাও (Callao) বন্দরে। সেটাও সহজ কাজ নয়; ক্যাল্লাও-তে গিয়ে পেঁছতেও লেগে গেল বেশ কিছুদিন। ততদিনে ক্যাল্লাও শহরের চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে তাঁদের অভিযানের খবর। দলে দলে লোক এসে ভিড় করতে লাগলো বন্দরের জেটিতে।

প্রথম কয়েকদিন কেটে গেল হৈ-হট্টগোলের মধ্যে। তারপর হেয়ারধালের নির্দেশ মত বন্দরের ডকইয়ার্ডে তৈরী করা শুরু হল তাঁদের অভিযানের ভেলা। কয়েক শত বছর আগে এমন কত ভেলাই তৈরী হয়েছে এখানে। ক্যাল্লাও ছিল ইনকা-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য কেন্দ্র। সেই কেন্দ্র থেকেই হেয়ারধালের যাত্রা হবে শুরু। কারণ এখান থেকেই এক সময় ইনকারা বেড়িয়ে পড়তো সমুদ্র-যাত্রায়। তাদের সেই সমুদ্র-যাত্রার এক চমৎকার কল্পনাশ্রয়ী বর্ণনা দিয়েছেন নৃতাত্ত্বিক কুন—

নাতিদূর অতীতে কোন এক সময় পলিনেশিয়ানদের পূর্ব-পুরুষেরা…কাঠের গুঁড়িতে খোদিত জোড়া জাহাজে পাল তুলে তাদের দ্বীপে উপস্থিত হয়েছিল। এ সব জাহাজের (?) মাঝি মাল্লারা সংখ্যায় ছিল অনেক। চৌকো ও কাঁকড়ার দাঁড়ার আকৃতি বিশিষ্ট পাল তুলে তারা বাতাসের মুখে এগিয়ে চলতো, বাতাসের উজানে চলতে হলে তারা দাঁড় বাইতো।…পিপাসায় প্রাণরক্ষার জন্য জাহাজে ভর্তি করে নারিকেল নিত তারা। এককেটি জাহাজ যেন এককেটি ভাসমান খামার বাড়ি। তাতে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতো, শুয়োর ঘোঁত ঘোঁত করতো, মোরগ কক্ কক্ করে ডাকতো। নাবিকের স্ত্রীরা জাহাজে বসে মিষ্টি আলুর কন্দ বুকের নীচে চেপে রাখতো, উত্তাপে যাতে বীজগুলো জীবন্ত থাকে।

বর্ণনা দীর্ঘ করে লাভ নেই। এর থেকেই সেকালের সমুদ্র যাত্রার একটা প্রাথমিক ধারণা আমরা গড়ে নিতে পারবো।

আগেই বলেছি হেয়ারধালের ভেলা তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল ক্যাল্লাও বন্দরে। সেই ভেলা দেখবার জন্যে প্রতিদিন দলে দলে ভিড় করছিল স্থানীয় অধিবাসীরা। ডকের কর্মীদের মধ্যেও দেখা গেল প্রবল উৎসাহ। তাদের উৎসাহে আর বিচক্ষণতায় কাজ এগোতে লাগলো বেশ ভালো ভাবেই।

বারোটা গুঁড়ির মধ্যে ন'টা মোটা ও লম্বা গুঁড়ি বেছে নেওয়া হল ভেলার পাটাতন তৈরীর জন্যে। বাকীগুলো দিয়ে তৈরী হবে মাস্তুল, হাল, কেবিন প্রভৃতি অন্যান্য জিনিস। সেই ন'টা গুঁড়ির মধ্যে একটা ছিল সবচেয়ে লম্বা—প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফুট। ঠিক হল সেটাই রাখা হবে ভেলার মাঝখানে।

নোনা জলে কাঠে পচন ধরে কিনা সেটা আগেই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। ফল হয়েছিল আশানুরূপ। তাই নারিকেলের দড়ি দিয়ে গুঁড়িগুলো একসঙ্গে বাঁধা হল ভেলার আকারে। পেরেক অথবা তার ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলেন না হেয়ারধাল! কারণ ইনকাদের কালে এর কোনটারই ব্যবহার জানা ছিল না। তারা দড়ি দিয়েই কাজ চালিয়েছে। তাছাড়া লোহার পেরেক ব্যবহারের ছিল অন্য বিপদ। নোনা জলে সহজেই মরচে ধরবে। তখন কাঠেরই ক্ষতি করবে সেগুলো!

ভেলা তৈরী হয়ে যাবার পর তার চেহারাটা দাঁড়ালো অনেকটা ইনকাদের জাহাজের মত। ভেলার সামনের দিকটা হল ত্রিভূজাকৃতি। ভেলার মাঝখানে যে গুঁড়িটা ছিল তার দৈর্ঘ্য পঁয়তাল্লিশ ফুট কিন্তু দুপাশে ব্যবহৃত গুঁড়ি দুটির দৈর্ঘ্য তিরিশ ফুট। মোটামুটি ছ'জন মানুষের নড়াচড়া করার মত জায়গা পাওয়া যাবে এই জাহাজে।

এরপর ভেলার ওপর বাঁশের চটা বিছিয়ে বানানো হল ডেক। সেই ডেকের মাঝখানে রইলো বাঁশের তৈরী ছোট কেবিন। সেই কেবিনের ওপর দেওয়া হল কলাপাতার আচ্ছাদন। কেবিনের সামনে রইলো শক্ত গরাণ কাঠের (Mangrove) তৈরী পাশাপাশি

হেলানো দুই মাস্তুল। মাস্তুল দুটির মাথা বাঁধা হল এক সঙ্গে। তারপর এক মস্ত চৌকো পাল ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল তার গায়ে।

তরী তৈরী। এবার জলে ভাসলেই হয়। কিন্তু তবু ভেসে পড়া সহজ নয়। শেষ মুহূর্তে বাধা আসতে লাগলো স্বজন-বন্ধুদের কাছ থেকে। রাষ্ট্রদূত আর বিভিন্ন নাবিকদের কাছ থেকে। তাঁরা ভেলার চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু এত দূর অগ্রসর হবার পর থমকে দাঁড়ানোর কোন মানেই হয় না।

তাই শুভদিনে ভেলার নামকরণ করলেন হেয়ারধাল। নাম হল—কনটিকি (KON TIKI)। পলিনেশীয় সূর্য দেবতার নাম অঙ্কিত হল ভেলার গায়ে। এরপর মালপত্র বোঝাই করার পালা। সেটাও সাঙ্গ হল দু'চার দিনে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ২৪শে এপ্রিল স্থির হল শুভযাত্রার লগ্ন।

(৩)

২৪শে এপ্রিল ১৯৪৭।

সেদিন ক্যাল্লাও উপসাগরের তীরে এসে ভিড় করেছে হাজার হাজার কৌতূহলী মানুষ। বন্দরের জেটিও লোকে লোকারণ্য। নোঙর করে থাকা জাহাজ আর ষ্টীমারের ডেকেও সমবেত হয়েছে মাঝি-মাল্লারা। এ ছাড়া দেশ-বিদেশ থেকে এসেছেন সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার।

যাত্রার সময় ঠিক করা ছিল আগে থেকেই। ঠিক ছিল, বন্দরের একটা গাধা বোট (tug-boat) প্রথম কয়েক মাইল টেনে নিয়ে যাবে কন্‌টিকিকে। বন্দরের সীমানা পার করে দিয়েই তার কাজ শেষ। তখন সে ফিরে আসবে বন্দরে। খাঁড়িটা পার হলেই কন্‌টিকি গিয়ে পড়বে প্রশান্ত মহাসাগরে। অনুকূল বাতাসে তখন পাল তুলে দেবেন অভিযাত্রীরা, শুরু হবে অভিযান।

জনতা ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে। তাই আর বিলম্ব করা যায় না। শেষবারের মতো সব কিছু পরখ করে নিয়ে ভেলায় গিয়ে উঠলেন হেয়ারধাল ও তার সঙ্গীরা। জেটির থেকে শোনা

গেল বহু মানুষের জয়ধ্বনি।

একটা মোটা শেকল দিয়ে গাধা বোটের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হলো কন্‌টিকিকে। সব আয়োজন শেষ, এইবার যাত্রা করলেই হয়। শেষ পর্যন্ত এলো নির্ধারিত সময়। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল বন্দরের গাধা বোটটি। এইবার তার নোঙর তুলে নিল সারেঙ্‌। চালু হ'ল তার এঞ্জিন। শোনা গেল বাঁশী। যাত্রা-সংকেত।

অবশেষে শেকলে লাগলো টান। গা ঝাড়া দিয়ে অকূল দরিয়ার দিকে ভেসে চললো গাধা বোট আর তার পেছনে কনটিকি। তখনো পেছন থেকে ভেসে আসছে শত কণ্ঠের উল্লাসধ্বনি। হাত নাড়ছে নানান্‌ বয়সের হাজার হাজার নর নারী। তাদের অভিনন্দনে অভিভূত হয়ে পড়লেন হেয়ারধাল।

ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল কন্‌টিকি। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এলো অপেক্ষমান নর-নারীর কলরব। খাঁড়ির মুখ পার হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাধা বোট। এইবার তার কাজ শেষ। শেকলের বাঁধন খুলে দিলেন অভিযাত্রীরা। বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বন্দরের দিকে ফিরে গেল কন্‌টিকির সহচরটি।

শেষবারের মতো সবাই ফিরে তাকালেন বন্দরের দিকে। তারপর মাস্তুলের গায়ে গুটিয়ে রাখা পালটা খুলে দিলেন তাঁরা। অনুকূল বাতাসে তর্‌ তর্‌ করে এগিয়ে চলল কন্‌টিকি। কাগজের নৌকোর মতো টলমল করতে করতে ছুটে চলল গন্তব্যের দিকে। প্রথম কয়েক ঘণ্টা বেশ ভাল ভাবেই কাটলো। বাতাসের গতি এবং দিক দুইই ছিল তাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল। এইভাবে বাতাসের সাহায্য পাওয়া গেলে হয়ত নির্দিষ্ট দিনের আগেই পৌঁছে যাবেন তাঁরা!

আবহাওয়াও চমৎকার। দুর্যোগের আভাস নেই কোথাও। তবু দুর্ভাবনা যে একেবারে ছিল না তা নয়।

সবচেয়ে বেশী ভয় এই অপ্‌লকা ভেলাটাকে নিয়ে। নারকেলের

দড়ি দিয়ে গুঁড়িগুলোকে বাঁধা হয়েছিল বেশ শক্ত করে। কিন্তু তিনমাস ব্যাপী এই অভিযানের ধকল সেই দড়ি সহ্য করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সকলেরই ছিল গভীর সন্দেহ। নোনা জলে যদি দড়িতে পচন ধরে তবে সব বাঁধনই ছিঁড়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। মাঝ দরিয়ায় যদি ছেঁড়ে তো কেলেঙ্কারির একশেষ। বালসার গুঁড়িগুলো তখন ভেসে যাবে নানা দিকে। আর অভিযাত্রীদের ঘটবে সলিল সমাধি।

কিন্তু কয়েকদিন কেটে যাবার পর দেখা গেল তাদের আশংকা অমূলক। বরং নরম কাঠ জলে ভিজে ফুলে গেল কিছুটা। আর নারকেলের দড়ির বাঁধন একেবারে কেটে বসল তার গায়ে। নাট-বল্টু ব্যবহার করলেও বোধহয় এত ভাল ফল পাওয়া যেত না। পেরুর মানুষেরা যে কেন দড়িকে বেছে নিয়েছিল এটা বুঝতেও কষ্ট হল না আর।

প্রথম দু'চার দিন কাটলো মোটামুটি নিরুপদ্রবে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। যে দিকেই দৃষ্টি যায় জল শুধু জল। সুনীল, ফেনিল জল রাশি। ঢেউ-এর চূড়ায় কখনও প্রখর রৌদ্রের স্বর্ণ-মুকুট, কখনো স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার রূপোলী আভরণ। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। দিন বদলের কালে জলের বুকে নানা রঙের খেলা। দূর থেকে ভেসে আসা এলবাট্রসের তীক্ষ্ণ কলরব, বাতাসের একটানা শব্দ, ঢেউ-এর ছল ছল কলধ্বনি। ক্রমে সমস্ত কিছুই নিতান্ত একঘেঁয়ে হয়ে গেল তাঁদের কাছে। অবশ্য তিন মাসের এই অভিযানের প্রতিটা দিনই যে এমন নিস্তরঙ্গ ভাবে ও নির্বিবাদে কেটেছে তা' ভেবে নিলে মহা ভুল করা হবে। বহু বিপদ ও দুর্যোগের সঙ্গেই পাঞ্জা লড়তে হয়েছিল হেয়ারধালকে।

সাতানব্বই দিনের এই রোমাঞ্চময় অভিযানের কাহিনী হেয়ার-ধাল লিখে রেখেছেন তাঁর "কনটিকি" বইটির মধ্যে। সেই বিবরণ থেকেই হেয়ারধালের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কিছুটা পরিচয়

পাওয়া যাবে। পরিচয় পাবো নিষ্ঠা ও সহনশীলতার।

প্রথমে দেওয়া যাক অঘটনের বৃত্তান্ত। ঝড়-বৃষ্টির দাপটেই তাঁদের বিপদে পড়তে হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝড়-তুফান লেগেই আছে। আকাশ অন্ধকার করে যখন মেঘ ঘনিয়ে আসতো তখনই সামাল সামাল তরী। পাহাড় সমান উঁচু ঢেউ-এর মোকাবিলা করা সহজ কাজ নয়। তার ওপর আছে ঘণ্টায় ষাট কি সত্তর মাইল বেগে ঝড়ের তাণ্ডব। কতবার মনে হয়েছে এই বুঝি জলে ছিটকে পড়লো অভিযাত্রীরা। এই বুঝি উলটে গেল তাদের ভেলা। বেশ কিছু রসদ ও যন্ত্রপাতি এই সময় বিসর্জন দিতে হয়েছে জলে। প্রাণটা যে রক্ষা পেয়েছে সেই ঢের।

অভিযাত্রীদের দিনলিপি (ডায়েরী) থেকে তাদের এক দিনের বিবরণ তুলে ধরলে ওই অভিযানের কিছুটা রোমাঞ্চ অনুভব করা যাবে।

সারা রাত পালা করে পাহারা দিতে হত কনটিকিকে। পাছে দিক ভ্রম হয় অথবা ঝড় তুফানে ঘটে বিপর্যয়, তাই এই ব্যবস্থা। খুব ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাতের পাহারাদারের কাজ শেষ। সে কলাপাতায় ছাওয়া কেবিনে গিয়ে জাগিয়ে দিত রাঁধুনীকে। ঘুমের আরাম ছেড়ে তখন কেই বা বেরিয়ে আসতে চায় স্লিপিং ব্যাগ থেকে। তাই রাঁধুনীও গজ গজ করতো বেশ কিছুক্ষণ। ঠাণ্ডা হাওয়ায় রীতিমত কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে তখন। কিন্তু না উঠে উপায়ও নেই। সকালের খাবার বানাতে হবে তাকে। ঘুম চোখে বন্ধুদের মনে মনে গাল দিতে দিতে রাঁধুনী মশাই গিয়ে দাঁড়াতেন জলে ধোওয়া ডেকের ওপর। তাঁর খাবার সংগ্রহের ব্যাপারটা ছিল বেশ মজাদার। রাতের অন্ধকারে পথ ভুলে কনটিকির ডেকের ওপর রোজ উড়ে আসতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছ (Flying fish)। রাঁধুনীর কাজ হল সেই মাছগুলো সংগ্রহ করেই চটপট একটা প্রাইমা স্টোভ জেবলে ভেজে ফেলা। ব্রেকফাস্টে

এই গরম গরম মাছ ভাজাটাই ছিল সব চেয়ে মুখরোচক। অবশ্য অভিযাত্রীদের টিন ভর্তি ফল,মাছ,মাংস প্রভৃতির অভাব ছিল না। এই সব খাদ্য প্রচুর পরিমাণেই এনেছিলেন তাঁরা। তবু সামুদ্রিক মাছই এই অভিযানে ছিল তাঁদের প্রিয় ও প্রধান খাদ্য।

সারা দিন ছবি তোলা, সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, পাল খাটানো ও নামানো ইত্যাদি কাজেই ব্যস্ত থাকতেন হেয়ারধাল ও তাঁর সঙ্গীরা। ছবি তোলার সুবিধার জন্যে রবারের তৈরী একটা ছোট ডিঙিও এনেছিলেন তাঁরা। যে দিন আবহাওয়া বেশ ভালো থাকতো সেদিন সেই ডিঙি চেপে তারা ঘুরে বেড়াতেন কনটিকির চারপাশে। সেখান থেকেই ছবি তোলা হ'ত কনটিকির। আর তার অভিযাত্রীদের।

(৪)

প্রায় প্রতিটি ফটোগ্রাফের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে অভিযাত্রীদের সুখ-দুঃখের ইতিকথা। তাই সেই ছবিগুলো যদি দেখাতে পারতাম তবে হয়তো আরো জীবন্ত হয়ে উঠত আমার এই বিবরণী।

দু'টি ছবির কথা সবার আগে মনে পড়ে। একবার তাদের মাছ ধরা জালে এসে পড়লো এক বিশাল হাঙর। বহু চেষ্টায় জীবন বিপন্ন করে অভিযাত্রীরা টেনে তুললেন তাকে। তারপর ভেলার ডেকে দাঁড়িয়ে তোলা হল এক ফটোগ্রাফ। কালান্তক প্রাণীটির পুচ্ছ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন জনৈক অভিযাত্রী। তাঁর রণক্লান্ত মুখে বিজয়ীর হাসি। হাঙরটি তখনো জীবিত। তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে জেগে আছে ধারালো দাঁতের সারি!

আর একটি ছবি তো রীতিমত রোমাঞ্চকর। একটি বিশাল নীল তিমি ভেসে চলেছে কনটিকির গা ঘেঁসে। আর চিত্রার্পিতের মত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছেন অভিযাত্রীরা। লেজটা সামান্য নাড়া দিলেই কনটিকির চিহ্ন মাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু শান্তি প্রিয় ঐ জীবটি তাঁদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে নি। ভেসে চলেছে নিজের খেয়ালে। আর সেই দুর্লভ মুহূর্তটিকে

ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন ফটোগ্রাফার।

আরো আছে! অজগরের মত এক বিশাল ম্যাকারেল ধরা পড়েছিল তাঁদের জালে। সেই শিকারটিকে কাঁধে ঝুলিয়ে হাসি হাসি মুখে শিকারী এসে দাঁড়িয়েছেন ক্যামেরার সামনে। আমাদের কিন্তু ঐ বীভৎস মাছটিকে দেখে গা শিউরে ওঠে!

অবশ্য ছবির দাবী চোখের কাছে। শুধু বিবরণ দিলে মন ভরবে না। তাই অভিযানের কথায় আবার ফিরে যাওয়া যাক।

কনটিকি অভিযানে খাদ্যের যে কোনদিন অভাব হয় নি সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু পানীয় জল সংরক্ষণ করাই হয়ে উঠেছিল এক সমস্যা। অবশ্য পিপে বোঝাই জল তাঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন। কিন্তু মাস দুয়েক থাকার পর সেই 'বাসি' জল হয়ে উঠলো বিস্বাদ আর দুর্গন্ধময়। পোকা ধরলো তাতে। তাঁদের ভয় হ'ল হয়তো ঐ বীজাণু ভরা জল খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন তাঁরা।

এই সময় ভগবানই যেন বাঁচিয়ে দিলেন। একদিন আকাশ ভেঙ্গে নামলো বৃষ্টি। উঃ সে কি বৃষ্টি! থামতেই চায় না। পানীয় জলের পাত্রগুলো ভর্তি হয়ে উঠলো কানায় কানায়। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অতি সহজেই।

বর্ষার দিনে তাঁদের জালে মাছও উঠতে লাগলো প্রচুর। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে বনিতোই (Bonito) বোধহয় সবচেয়ে মুখরোচক। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘুরে বেড়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের ঐ বিশেষ অঞ্চলে। মনের সুখে সেই বনিতো মাছ ধরতে লাগলেন অভিযাত্রীরা।

বর্ষা এসে পড়ায় ঝড়-বৃষ্টির দাপটও ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। তাই কোন কোন রাতে দুর্যোগের দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যেত হেয়ারধালের। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতেন ডেকের ওপর। কিন্তু কৈ মেঘের চিহ্ন নেই কোনখানে। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে অগণিত নক্ষত্র। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে তারই প্রতিবিম্ব। ঢেউ-

এর চূড়ায় ফসফরাসের মালা। এ দৃশ্য বড়োই পরিচিত ও স্বাভাবিক। নাঃ, এ নিতান্তই দুঃস্বপ্ন।

আর একটা আশঙ্কা ছিল অভিযাত্রীদের। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অগণিত অক্‌টোপাসের আস্তানা। ঐ কদাকার অষ্টপদ প্রাণীটিকেও ছিল তাঁদের ভয়। রাতের অন্ধকারে তারা চুপি চুপি যদি কনটিকিকে মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে তবে আর রক্ষে নেই। ভেলা উলটে সকলেরই ভাগ্যে তখন ঘটবে সলিল সমাধি। এ ছাড়া লম্বা বাহু মেলে কনটিকির ওপর থেকে অতর্কিতে অভিযাত্রীদের ছিনিয়ে নেবার চেষ্টাও করতে পারে সেই শয়তান। সেই ভয়ে সদাই শঙ্কিত থাকতেন তাঁরা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব আশঙ্কাই কেটে গেল। অকটোপাস সম্পর্কে প্রচারিত নানা কাহিনীর মূলে কোন সত্য খুঁজে পেলেন না তারা। সমুদ্রতলবাসী এই প্রাণীগুলো মোটামুটি নির্জনতাপ্রিয়। মানুষকে তারা সাধ্যমত এড়িয়ে চলে। ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণীই তাদের খাদ্য।

কনটিকি অভিযানের নিত্যসঙ্গী ছিল আর একদল প্রাণী। তাদের জন্ম তিমি বংশে। নাম ডলফিন। এরা প্রতিদিন প্রচুর আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে অভিযাত্রীদের। তাদের শোভাযাত্রা সত্যি একটা দেখবার জিনিস।

হেয়ারধালের সঙ্গে ছিল একটা ছোট বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র। নিকটবর্তী জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যেই আনা হয়েছিল সেটা। কিন্তু ঐ কাজে ওটাকে ব্যবহার করার সুযোগ তাঁরা বিশেষ পাননি। তবে ঐ প্রেরক যন্ত্র মারফত মাঝে মাঝে আবহাওয়া বার্তা প্রচার করতেন অভিযাত্রীরা। অবশ্য সে খবর আদৌ কারও কোন কাজে লাগছে কিনা সেটা পরখ করার কোন চেষ্টা তাঁরা কোন দিন করেননি।

অবশেষে এল ৩০শে জুলাই। ক্যাল্লাও বন্দর ছাড়বার ঠিক তিন মাস বাদে তাঁরা দিগন্তে প্রথম দেখতে পেলেন অস্পষ্ট তীর-

ভূমি! তখন কী আনন্দ আর উত্তেজনা! তবে তো পথ ভুল হয়নি। ঠিক পথেই চলেছেন তাঁরা। অবশ্য টুয়ামোটো দ্বীপপুঞ্জে পেঁছতে এখনো কিছু পথ বাকী। তাঁদের যেতে হবে আরো কিছু দূর। তাই নাম না জানা ছোট্ট দ্বীপটিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললো কনটিকি।

আগস্টের সাত তারিখে পূর্ণ হল সাতানব্বই দিন। হেয়ারধাল দূরবীণ হাতে নিয়ে তাকালেন দিগন্তে। ঐ তো দেখা যায় টুয়ামোটো দ্বীপপুঞ্জ, তার প্রবাল বলয়। ডুবো পাহাড়ের চুড়াগুলো শুধু জেগে আছে জলের বুকে। কিন্তু পথ অতিশয় দুর্গম। তাই দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে নোঙর করলো কনটিকি। পূর্ব পরিকল্পনা মত এখন দ্বীপের থেকে আসবে একটা ছোট ডিঙি নৌকা (canoe)। তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে দ্বীপের দিকে। কিন্তু মন ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে। হঠাৎ দিগন্তে দেখা গেলো ছোট্ট ক্যানোটিকে। নৌকা বেয়ে কনটিকির দিকে এগিয়ে আসছে দু'টি পলিনেশীয় যুবক।

কনটিকির কাছে পেঁছানো মাত্র তাদের একজন লাফিয়ে পড়লো ডেকের ওপর। তার পর হাত তুলে অভিনন্দন জানানোর ভঙ্গীতে বল্লে—Good Night!

ঐ একটা মাত্র ইংরেজী কথাই জানা ছিল তার।

এই দ্বীপে সাময়িক বিশ্রাম নেবার পর কনটিকিকে আবার ভাসানো হল জলে। কারণ পেঁছতে হবে রারোইয়ায় (Raroia)। এখানেই ঘটবে চূড়ান্ত যাত্রা বিরতি। ১০১ দিন বাদে ৪৩০০ মাইল পথ পরিক্রমা সেরে হেয়ারধাল পেঁছে গেলেন তাঁর গন্তব্যে।

আমুণ্ডসেনের পর অমর অভিযাত্রী হিসাবে ইতিহাসে চিরকাল নাম লেখা থাকবে হেয়ারধালের।

হেয়ারধালের নাম কেউ কেউ উচ্চারণ করেন 'হেয়ারডাল' আবার কেউ 'হেয়ারড্‌হাল'। আমরা নওরেজীয়ান উচ্চারণটাই মোটামুটি অনুসরণ করেছি।

কর্নটিকি অভিযান কালে হেয়ারধালের বয়স ছিল ৩২। ৯৭ দিন পরে ডাঙায় পা দিলেও তাঁদের অভিযান শেষ হতে লাগে ১০১ দিন। অফিসিয়াল রেকর্ডে তাই ১০১ দিনই লেখা আছে।

হেয়ারধালের সঙ্গীদের নাম এরিক হেসলবার্গ, হারমান ওয়াজিংগার, বেঙ্গট্ ডানিয়েলসন, নুট হগ্‌ল্যান্ড ও টর্সট্রিন ব্যারি।

এরপরে আরও একটি অভিযানে হেয়ারধাল আফ্রিকার সোফি বন্দর থেকে প্যাপিরাসের তৈরী নৌকা চড়ে সাত জন সঙ্গী নিয়ে আমেরিকার ইউকাটান বন্দর অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেই 'রা' অভিযান নানা দুর্ঘটনায় পরিত্যক্ত হয়।

দুরন্ত ঝাঁপ

১৯৪৪ সালের মার্চ মাস ; তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলছে ইউরোপের সর্বত্র। প্রায় প্রতিদিনই বৃটিশ বোমারু বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়ে হানা দিচ্ছে বার্লিনের দোর গোড়ায়। হিটলারের সাম্রাজ্যই তখন টলমল। ঠিক সেই সময় ঘটেছিল ঘটনাটা। একদিন রাতে হিটলারের সদর দপ্তরের ওপর বোমা ফেলার মতলবে আকাশে উড়লো এক ঝাঁক ল্যানকাস্টার বিমান। তারই একটাতে ছিলেন ফ্লাইট সার্জেণ্ট আলকামেড। বিমানের ককপিটে বসানো মেশিনগানটি চালানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। ট্রিগারে আঙুল ছুঁইয়ে সতর্কভাবে বসেছিলেন তিনি। কারণ জার্মান সীমান্তের কাছাকাছি এসে পেঁছেছেন তাঁরা, এখন যে কোন মুহূর্তেই আক্রমণ করতে পারে জার্মান টহলদার বিমান। ঠিক সেই সময়েই কানে এলো এক প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আলকামেড তাকিয়ে দেখেন পিছন থেকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে একটি নাৎসী বিমান। তারই এক গোলা সোজা এসে লেগেছে ল্যানকাস্টারের এঞ্জিনে। তাই মেশিনগান চালানোর আর সুযোগ পেলেন না ফ্লাইট সার্জেণ্ট। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে গেল ককপিটে। লেলিহান শিখা গ্রাস করল পাইলটকে। প্যারাস্যুটের জন্যে তখনই হাত বাড়ালেন আলকামেড। কিন্তু কি সর্বনাশ ওটাও যে জ্বলছে। বাঁচার কোন রাস্তাই আর যে খোলা নেই সামনে। হয় পুড়ে মরতে হবে আগুনে আর না হয় সাড়ে তিন মাইল ওপর থেকে ঝাঁপ দিতে হবে বিনা প্যারাস্যুটে। সে মুহূর্তে শেষ রাস্তাটাই বেছে নিলেন আলকামেড। তারপর ঝটাপট বিপদকালীন দরজা খুলে ঝাঁপ দিলেন মহাশূন্যে।

ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতের হীমশীতল বাতাস এসে লাগলো চোখে-মুখে। পতনের বেগে প্রথমটায় যেন দম বন্ধ হয়ে

এল তাঁর। তবু চেয়ে দেখলেন জ্বলন্ত উল্কার মত ল্যানকাস্টার বিমানটি মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার দিগন্তে। চারিদিক থেকে গাঢ়, শীতল অন্ধকার যেন ছুটে আসছে আলকামেডের দিকে। প্রবল আতঙ্কে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জ্ঞান হারালেন তিনি।

চেতনা ফিরলো প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে। চোখ মেলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন আলকামেড। এখনো বেঁচে আছি আমি! এই বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে লাগলো প্রায় আধ ঘণ্টা। তারপর বেশ কয়েক ফুট গভীর, তুলোর মত নরম তুষারের স্তূপ সরিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন তিনি। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। ফির আর পাইন গাছের ডালে ডালে অবিশ্রান্তভাবে ঝরে পড়ছে তুষার কণা। সেই প্রবল তুষারপাতে ঢাকা পড়ে গেছে সারা এলাকাটা। আকাশের দিকে তাকালেন ফ্লাইট সার্জেণ্ট—ওই তো জ্বল জ্বল করছে শুকতারা। সত্যিই তবে বেঁচে আছি আমি—প্রচণ্ড উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল তাঁর, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বার হল না সেই মুহূর্তে। শরীরের নানা জায়গায় পোড়ার জ্বালা; ডান পা, কোমর আর মাথায় চোট লেগেছে বেশ ভালো রকমই। তবু প্রাণটা এখনও ধুক ধুক করছে বুকের মধ্যে। অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে গেছেন ফ্লাইট সার্জেণ্ট আলকামেড। পালক-নরম প্রায় চার ফুট গভীর তুষারের আস্তরণ আর ফির গাছের ঘন ডালপালা এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

কিন্তু ভাবনার সময় কোথায়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে সারা শরীর। তাই সব শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু হাঁটুর হাড়টা ভেঙ্গেছে সম্ভবত। তাই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কেঁপে উঠলো সারা দেহ। মাথাটা ঘুরে উঠলো বন বন করে। আবার লুটিয়ে পড়লেন আলকামেড। এখন উপায়? যেমন করেই হোক খবর দিতে হবে নাৎসী বাহিনীকে। তাই টহলদার-দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ছেঁড়া জামার পকেট থেকে বার করলেন সার্জেণ্টের বাঁশি। তারপর সজোরে ফুঁ দিলেন তাতে।

শেষ রাতের নীরবতা ভেঙ্গে বেজে চললো সেই বাঁশি ; প্রায় দশ মিনিট বাদে কানে ভেসে এলো একটা ঘর ঘর আওয়াজ। বরফের স্তূপ ঠেলে, ফির গাছের ভাঙ্গা ডাল মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে কয়েকটা বাঘা ট্যাংক। তীব্র সার্চলাইট জেবলে এগিয়ে আসছে ওই যন্ত্র দানবেরা। তাই ছেঁড়া টিউনিকটা নিশানের মত প্রাণপণে নাড়তে লাগলেন আলকামেড। যেমন করেই হোক চোখে পড়তে হবে ওদের। শেষ পর্যন্ত সফল হল তাঁর উদ্দেশ্য। সার্চ-লাইটের আলো এসে পড়লো তাঁর গায়ে। তারপর আবছায়া অন্ধকারে প্রেতের মত কয়েকটা ছায়া বেরিয়ে এলো একটা ট্যাঙ্কের আড়াল থেকে। হ্যাঁ, ওরা দেখতে পেয়েছে তাঁকে, এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে। প্রবল উত্তেজনায় আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন ফ্লাইট সার্জেন্ট।

জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু গোয়েন্দা দপ্তরের কেউই বিশ্বাস করতে চায় না আলকামেডের বৃত্তান্ত। বিনা প্যারাস্যুটে অত উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়েছে এই বৈমানিক! তা আবার কখনো হয় নাকি? আর ঝাঁপ দিলেও বেঁচে আছে সেই গল্প বলার জন্যে। যতসব গাঁজাখুরি কথা। কিন্তু আলকামেড নাছোড়বান্দা। যা সত্যি, তা তিনি অস্বীকার করেন কি করে। অবশেষে তাঁর কথা মত নির্দিষ্ট স্থানে শুরু হল খোঁজাখুঁজি। অনেক অনুসন্ধানের পর পাইন বনের মধ্যে পাওয়া গেল বিধ্বস্ত ল্যানকাস্টার বিমানটি। তার ককপিটে দেখা গেল পড়ে রয়েছে আধ পোড়া প্যারাস্যুটটিও। সেই প্যারাস্যুটের গায়ে লাগানো ছিল একটি কাগজের টুকরো। তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আলকা-মেডের নাম। তখন সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাই মেনে নিতে হল নাৎসী সরকারকে। প্রায় তিন মাইল উচ্চতা থেকে বিনা প্যারাস্যুটে এই বন্দী বৈমানিক ঝাঁপ দিয়েছে বেপরোয়াভাবে। আর বরাত জোরে বেঁচেও আছে শেষ পর্যন্ত। আলকামেডের এই লাফের রেকর্ড আজও ভাঙ্গতে পারে নি কেউ।

পলাতক হিউ এন সাঙ

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তেরশ বছর আগের কথা। চীনদেশের সম্রাট ছিলেন তখন থাঙ বংশের থাইচুঙ। সে দেশের তরুণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিউ এন সাঙ চীন দেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আসার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদন করলেন। উদ্দেশ্য তথাগত বুদ্ধের জন্মস্থান পশ্চিমদেশ—ভারতবর্ষে গিয়ে সেখানকার বৌদ্ধতীর্থগুলি দর্শন করবেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে বৌদ্ধ-ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চয় করবেন। তখন এটাই নিয়ম ছিল, নিজের দেশ ছেড়ে অন্যদেশে যেতে হলে সম্রাটের অনুমতি চাই। কিন্তু সম্রাটের অনুমতি পাওয়া গেলনা। মাত্র কিছুদিন আগে, ৬২৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট থাইচুঙ চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। দেশে তখনও ভালভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অরাজকতা, হানাহানি তো লেগেই ছিল—এমনকি বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়ও ছিল। এরকম অবস্থায় একজন সন্ন্যাসীকে দেশ ছেড়ে সুদূর বিদেশ পর্যটনে যেতে দিতে রাজি হলেন না সম্রাট। তাছাড়া ভারতবর্ষে যাবার পথ তো ভয়ংকর দুর্গম, বিপদসংকুল। শ্বাপদসংকুল ভয়ংকর অরণ্য, তপ্ত বালুরাশিতে পূর্ণ বিশাল মরুভূমি, তুষারাবৃত দুর্গম পর্বত, দস্যু-ডাকাত, ঝড়-ঝঞ্ঝা—এই পথে পা বাড়ানোর অর্থই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিজেকে ঠেলে দেওয়া। অতএব হিউ এন সাঙের আবেদন না মঞ্জুর হল।

পথের বিপদের কথা যে হিউ এন সাঙ-এর অজানা ছিল তা নয়। কিন্তু নির্ভীক সন্ন্যাসীর কাছে কোনো বিপদই বিপদ নয়—আর মৃত্যুভয় তো তুচ্ছ মাত্র। ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় বাণীর সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ধর্মগুরু হিউ এন সাঙের অন্তর। এ

আকুলতার কাছে কোনো বাধাই আর বাধা নয়। সম্রাটের অনুমতি না পেয়ে প্রথমে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুমতি ছাড়াই দেশ ছেড়ে যাবার সংকল্প করলেন।

কিন্তু সম্রাটের আদেশ অমান্য করে দেশের সীমানা পার হওয়া তো আর মুখের কথা নয়। সীমান্তে রক্ষীদের সদাজাগ্রত পাহারা। ধরা পড়লে ভয়াবহ শাস্তি হতে পারে। সেই ভয়ে হিউ এন সাঙের অন্যান্য সঙ্গীরা তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হলনা। নির্ভীক হিউ এন সাঙ কিন্তু তাঁর সংকল্পে অটল।

ঠিক ওই সময়েই এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। বিশাল মহাসমুদ্রের বুকে জেগে রয়েছে যেন সুমেরু পর্বত। সমুদ্রের বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে এসে। পর্বতের চূড়ায় ওঠার জন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে তিনি ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল তাঁকে বহন করে নিয়ে গেল একেবারে পর্বতের নিচে। পর্বতে ওঠার জন্য তিনি যখন প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন একটা ঘূর্ণী বাতাস এসে তাঁকে তুলে নিয়ে পেঁছে দিল একেবারে পর্বতের চূড়ায়। পর্বতচূড়ায় উঠে হিউ এন সাঙ দেখতে পেলেন চারদিকে কত অজানা, বিচিত্র সব দেশ। ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর দেহ। এ স্বপ্ন কিসের ইঙ্গিত ? পর্বতচূড়ায় উঠে তিনি যেন দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর না দেখা সেই দেশ, ভারতবর্ষকে—যে দেশে যাবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল। আর দেরী নয়, শুভযাত্রার এই তো সময়।

এ ঘটনার কিছুদিন বাদে, ৬২৯ খৃষ্টাব্দে হিউ এন সাঙ যাত্রা করলেন পশ্চিমদেশ ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে—কিন্তু খুব গোপনে, রাজশক্তির সতর্ক পাহারা এড়িয়ে। দুর্গম পথের নির্ভীক অভিযাত্রী হিউ এন সাঙের বয়স তখন মাত্র আটাশ বছর। সৌম্য-

কান্তি দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা; বুদ্ধিদীপ্ত, সুশ্রী মুখমণ্ডল। স্বভাবে তিনি ছিলেন খুবই নম্র, করুণাময় কিন্তু ব্যক্তিত্বপূর্ণ। তাঁর গম্ভীর, সুমিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে শ্রোতারা তাঁর কথা শুনত। পাণ্ডিত্যে তিনি ছিলেন তখনকার চীনদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দুজন ভিক্ষু সঙ্গী, কয়েকটি বৌদ্ধশাস্ত্র ও সামান্য কিছু পাথেয় মাত্র সম্বল করে এগিয়ে চললেন হিউ এন সাঙ চীনদেশের পশ্চিম সীমান্তের দিকে। হৃদয়ে তাঁর অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা, চোখে সদা সতর্ক দৃষ্টি।

পশ্চিম সীমান্তশহর লিয়াং চাউতে নির্বিঘ্নে পেঁাছে গেলেন তিনি। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে জনমানবশূন্য দুর্গম বন্ধুর পথ। চারিদিকে বড় বড় ঘাসের বন। সে বনে লুকিয়ে আছে কত হিংস্র জন্তু। দস্যু-ডাকাতের ভয়ও ছিল। উত্তরে ভয়ংকর গোবি মরুভূমি, দক্ষিণে কাকোরের মালভূমি। তাছাড়া সীমান্ত-শহর থেকে বেরোতে হলে চাই সম্রাটের পরোয়ানা যা হিউ এন সাঙের ছিলনা। তাই দিনের আলোয় শহর ত্যাগের ঝুঁকি নিলেন না তিনি। রাতের অন্ধকারে সীমান্তরক্ষীদের পাহারা এড়িয়ে শহর ত্যাগ করতে সক্ষম হলেন।

এবার এগিয়ে চললেন উত্তর-পশ্চিম দিকে। সাবধানে পথ চলেন, দিনের আলোয় লুকিয়ে থাকেন সঙ্গীদের নিয়ে—অন্ধকার নেমে এলেই শুরু হয় পথচলা। কিন্তু এত সাবধানে থেকেও বুঝি আর শেষরক্ষা হলনা। হিউ এন সাঙ খবর পেলেন সীমান্ত-রক্ষীর দল জানতে পেরেছে সম্রাটের আদেশ অমান্য করে তাঁর দেশত্যাগের কথা। পলাতক হিউ এন সাঙকে গ্রেপ্তার করতে সম্রাটের লোক পিছু নিয়েছে তাঁর। আরও খবর পেলেন যে-পথে তিনি চলেছেন, ওই পথেই আছে কুড়ি মাইল অন্তর পাঁচটা পাহারা স্তম্ভ। ওই পাহারাস্তম্ভগুলি এড়িয়ে যাবার কোন রাস্তাই নেই। দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল হিউ এন সাঙের মুখে। কিন্তু অটুট তাঁর মনোবল।

সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে তথাগত বুদ্ধের নাম স্মরণ করে আরও সাবধানতার সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন।

বিপদের ওপর আরও বিপদ। ঠিক ওই সময়েই ওই দুর্গম পথের সবচেয়ে বড় অবলম্বন তাঁর ঘোড়াটা হঠাৎ মরে গেল। রক্ষীরা পিছু নিয়েছে শুনে তাঁর সঙ্গীরা আগেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এবার সুযোগ বুঝে তাঁরা হিউ এন সাঙকে ত্যাগ করে চলে গেল। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন ধর্মগুরু হিউ এন সাঙ। কিন্তু কোন কিছুতেই বিচলিত হবার পাত্র নন তিনি। পায়ে হেঁটে একাই এগিয়ে যেতে লাগলেন।

কিছুদূর গিয়ে একটা বৌদ্ধ মন্দির দেখতে পেয়ে প্রবেশ করলেন। মন্দিরের বোধিসত্ব মৈত্রেয় সন্ন্যাসী হিউ এন সাঙকে দেখে পরম সমাদরে আপ্যায়ন করে আশ্রয়দান করলেন। ওখান থেকে একটি নতুন ঘোড়া সংগ্রহ করলেন হিউ এন সাঙ এবং তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন লোকের খোঁজ করতে, এক বিদেশী বৌদ্ধ যুবক নিজে থেকে এসেই তাঁর পথপ্রদর্শক হতে রাজি হল। নতুন ঘোড়া এবং বিদেশী যুবকটিকে নিয়ে যাবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছেন ঠিক তখনই এক বিদেশী বৃদ্ধ এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল। নানারকম বিপদের উল্লেখ করে ওই ভয়ংকর দুর্গম পথে ভারতবর্ষে যাবার সংকল্প ত্যাগ করতে হিউএন সাঙকে অনুরোধ করল। কিন্তু হিউ এন সাঙ বদ্ধপরিকর। বৃদ্ধের উপদেশে তিনি কিছুটা বিরক্তও হলেন। তিনি জানালেন, এ সংকলপ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, যত বাধা-বিঘ্ন, বিপদই আসুক না কেন তিনি ভারতবর্ষে যাবেনই।

অনেক পীড়াপীড়ি করেও বৃদ্ধ যখন হিউ এন সাঙকে নিরস্ত করতে পারলনা তখন একটা লাল রঙের রোগা বুড়ো ঘোড়াকে নিয়ে এসে বলল, এটা রাস্তা চেনে, আপনি এটা নিয়ে আপনার ঘোড়াটা আমাকে দিয়ে যান। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কি

যেন ভাবলেন হিউ এন সাঙ। হঠাৎ আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি খুশি হয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর ঘোড়াটা বদল করলেন। আশ্চর্য, কিছুদিন আগে এক জ্যোতিষী তাঁকে বলেছিলেন এরকম ঘটনা ঘটবে।

আবার পথচলা। কিছুদিন পরে সঙ্গের বিদেশী যুবকটি বিপদের পথে আর বেশিদূর এগোতে চাইল না। আবার নিঃসঙ্গ হলেন হিউ এন সাঙ। সঙ্গী কেবল অস্থিচর্মসার বুড়ো লাল ঘোড়াটি।

এভাবে কিছুদিন চলার পর তিনি ভয়ংকর গোবি মরুভূমির প্রান্তে এসে পেঁছলেন। যেদিকে দুচোখ যায় শুধু বালি আর বালি। কোথাও জনমানব, গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। তপ্ত বালুরাশিতে নেই কোন নির্দিষ্ট পথ ; শুধু মাঝে মাঝে বহুদিন আগেকার কোন মৃত যাত্রীর হাড়গোড় বা উটের শুকনো মল এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে। সেই মৃত মানুষের হাড় আর উটের মল অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ।

এভাবে মরুভূমির ওপর দিয়ে চলতে চলতে একদিন একটা ভয়ংকর দৃশ্য দেখলেন তিনি। দূর দিগন্তে যেন শত শত যোদ্ধা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; হাতে তাদের রঙীন নিশান আর ঝকঝকে বর্শা। আর একদিকে বহু সুসজ্জিত উট আর ঘোড়া। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন হিউ এন সাঙ। মুহূর্তে দৃশ্যপটের পরিবর্তন হল—আবার নতুন দৃশ্য। একি দেখছেন তিনি ? নির্জন মরুভূমিতে দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেতেরা তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে ? স্মরণ করলেন ভগবান বুদ্ধের নাম। আকাশ থেকে যেন ভেসে এল অভয়বাণী 'ভয় নাই, ভয় নাই।' মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আবার এগিয়ে চললেন তিনি।

কিছুদিন পরে হিউ এন সাঙ চীনদেশের পশ্চিম সীমান্তে রক্ষীদের প্রথম পাহারা স্তম্ভের কাছে পেঁছলেন। মরুভূমির দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তৃষ্ণায় অধীর উঠেছেন। খুঁজতে খুঁজতে কাছেই একটা ঝর্ণার সন্ধান পেলেন। কিন্তু দিনের আলোয় ঝর্ণার কাছে গেলে কেউ তাঁকে দেখে ফেলতে পারে, তাই সারাদিন বালির মধ্যে গর্ত করে লুকিয়ে রইলেন। রাতের অন্ধকারে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে চুপি চুপি এগিয়ে গেলেন ঝর্ণার দিকে। অঞ্জলি ভরে পান করলেন ঝর্ণার মিষ্টি জল। জলপান শেষ করে জলপাত্র পূর্ণ করে নিচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ একটা তীর এসে মাটিতে গেঁথে গেল। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলেন হিউ এন সাঙ। বুঝতে পারলেন রক্ষীরা তাঁকে দেখে ফেলেছে, আর কোন উপায় নেই, ধরা পড়ে গেছেন তিনি। দুহাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠলেন, আমায় তীর মেরোনা, আমি রাজধানী থেকে আগত সন্ন্যাসী। এই বলে নিজেই দুর্গের দিকে এগিয়ে গিয়ে রক্ষীদের কাছে ধরা দিলেন। রক্ষীরা তাঁকে নিয়ে গেল প্রধান দুর্গরক্ষীর কাছে।

সৌভাগ্যক্রমে প্রথম পাহারা স্তম্ভের প্রধান দুর্গরক্ষী ছিলেন বৌদ্ধ। তাই সে যাত্রায় বন্দী হতে হোল না হিউ এন সাঙকে। বরং বৌদ্ধ সন্নাসী দেখে দুর্গাধ্যক্ষ যথেষ্ট সমাদর করল তাঁকে এবং এখানে তাঁর আসার কি উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করল। হিউ এন সাঙ তাঁর ভারতবর্ষে যাবার অভিপ্রায়ের কথা জানালেন। কিন্তু দগাধ্যক্ষ তাঁকে ওই ভয়ংকর দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারতবর্ষে যেতে নিষেধ করল। বলল টুনহুয়াং-এ একজন ধর্মগুরু আছেন, হিউ এন সাঙ তার শিষ্যত্ব নিয়ে তার কাছে গিয়ে থাকতে পারেন। সামান্য একজন দুর্গরক্ষীর এই উপদেশে হিউ এন সাঙ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং কঠিন ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করলেন। তাঁর ভারতবর্ষে যাবার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলে সবশেষে বললেন, 'যদি আপনি আমাকে বাধা দেন তবে আপনার কাছেই আমার প্রাণ দেব,

তবু চীন দেশের দিকে এক পাও ফিরব না।'

হিউ এন সাঙের এই দৃঢ় সংকল্পে ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধায় দুর্গাধ্যক্ষের মাথা নত হয়ে এল। আর বাধা দিল না সে। কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে প্রথম পাহারা স্তম্ভ থেকে আবার যাত্রা শুরু করলেন হিউ এন সাঙ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাহারা স্তম্ভ এড়িয়ে সোজা চলে এলেন চতুর্থ পাহারা স্তম্ভে। আসার সময় প্রথম দুর্গাধ্যক্ষ তাঁকে বলে দিয়েছিল, চতুর্থ দুর্গাধ্যক্ষ তার আত্মীয় এবং তার মতই ধার্মিক বৌদ্ধ। চতুর্থ পাহারা স্তম্ভেও খুব সমাদর লাভ করলেন তিনি। সেখান থেকে যাত্রা করার সময় চতুর্থ দুর্গাধ্যক্ষ তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল, তিনি যেন সীমান্তের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দুর্গের কাছে কখনও না যান, কারণ সে দুর্গাধ্যক্ষ বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী। সুতরাং পঞ্চম দুর্গের রক্ষীদের হাতে ধরা পড়লে নির্ঘাৎ হিউ এন সাঙকে বন্দী করে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

একে একে বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন ধর্মগুরু হিউ এন সাঙ। এবার শেষ বাধা এবং কঠিনতম। এই বাধা অতিক্রম করতে পারলেই তাঁর পলায়নপর্ব শেষ। পঞ্চম দুর্গকে এড়াতে গেলে সাধারণ যাত্রীদের পরিচিত পথ ধরে যাওয়া চলবেনা। তাই সোজা পথে না গিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকের মরুভূমির অপরিচিত দুর্গম পথকেই বেছে নিলেন তিনি।

আবার মরুভূমি। নির্জন মরুপথে নিঃসঙ্গ যাত্রী সন্নাসী হিউ-এন সাঙ। যে পথে মানুষ যায়না সেই ভয়ংকর পথে জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এগিয়ে চলেছেন স্থির লক্ষ্যের দিকে। নির্জন মরুভূমিতে জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই, নেই জল, পশুর খাদ্য। যেদিকে দুচোখ যায় শুধু বালি আর বালি। তপ্ত বালিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মড়ার হাড় আর উটের মল অনুসরণ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। নিজের দেহের ছায়া তাঁর এক মাত্র সঙ্গী; সময় নির্ণয় করছেন সেই ছায়া দেখে।

এদিকে কিছুদিন পথচলার পর তাঁর জলের পাত্র শূন্য হয়ে এল। তিনি শুনেছিলেন এখানে বন্য অশ্বের প্রস্রবণ নামে একটি প্রস্রবণ আছে। অনেক খুঁজেও তিনি সেই প্রস্রবণের সন্ধান করতে পারলেন না। তৃষ্ণার্ত হিউ এন সাঙ জলপাত্রের শেষ তলানীটুকু পান করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, হাত থেকে ভারী জলপাত্র পড়ে গেল বালির ওপর। সব জল নষ্ট হয়ে গেল। তৃষ্ণা মেটাবার কোন আশাই আর রইল না। তৃষ্ণা নিয়েই আবার শুরু হল পথ চলা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই পথ হারিয়ে ফেললেন। অনেক চেষ্টা করলেন পথ খুঁজে পাবার—কিন্তু সব বৃথা। দুশ্চিন্তার কালো ছায়া পড়ল তাঁর মুখে। এখন যে পথে এসেছিলেন সে পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। হতাশ মনে ক্লান্ত দেহ নিয়ে সেই চতুর্থ পাহারা স্তম্ভে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন। এই প্রথম সংকল্পচ্যুত হলেন হিউ এন সাঙ। কিন্তু চারক্রোশ রাস্তা ফিরে এসেই তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল—ভারতবর্ষে পৌঁছাতে না পারলে চীনের দিকে এক পাও ফিরবনা। পূর্বদেশে ফিরে যাওয়ার চেয়ে পশ্চিমদিকে মুখ ফিরিয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হলেন উত্তর-পশ্চিম দিকে।

চলতে চলতে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্রমশ দুর্বলহয়ে এল তাঁর শরীর, কিন্তু চলার বিরাম নেই। দিনে মরীচিকার হাতছানি, রাতে নানারকম অলৌকিক অনুভূতি—সব উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছেন ধর্মগুরু। তার ওপর আছে বালির ঝড়। মরুভূমিতে এই বালির ঝড় যে কি ভয়ংকর যার অভিজ্ঞতা নেই বুঝতে পারবে না। হঠাৎ সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে আসে। একটা চাপা গর্জনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বাতাসের দাপাদাপি। ঝড়ের দাপটে রাশি রাশি বালি আর পাথরের টুকরো শূন্যে উড়ে গিয়ে আবার তীব্র বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথার ওপর। মাথার ওপর বড় বড় পাথরের টুকরোর ঠোকাঠুকি আর ঝড়ের তাণ্ডব যেন ধ্বংস

করে দিতে চায় পৃথিবীটাকে।

এভাবে চল্লে বেশ কিছুক্ষণ। ঝড়ের তাণ্ডব থেকে মাথা বাঁচিয়ে এগিয়ে চলেছেন হিউএন সাঙ। কিন্তু অসহ্য তৃষ্ণায় দেহ যেন আর বইছে না, সঙ্গী ঘোড়াটার গতিও কমে আসছে। পাঁচদিন একফোঁটা জলও পেটে পড়েনি। আর এগোতে পারলেন না, হাত-পা অবশ হয়ে এল। অবসন্ন দেহে শুয়ে পড়লেন বালির ওপর। কিন্তু বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের নাম স্মরণ করতে ভুললেন না। প্রার্থনা করলেন, 'আমি ধন, মান, যশ কিছুই চাইনা, আমি তো জ্ঞান আর সত্যধর্মের অন্বেষণে চলেছি। হে বোধিসত্ত্ব সংসারের দুঃখ-বেদনা থেকে জীবকে উদ্ধার করেন আপনি, আমার এ দুঃখ কি আপনি দেখছেন না? সারারাত ধরে প্রার্থনা করলেন। মাঝ-রাতে হঠাৎ একটা স্নিগ্ধ শীতল বাতাস তাঁর দেহের ওপর দিয়ে মধুর স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল। মনে হ'ল যেন কোন শীতল ঝর্ণার জলে তিনি স্নান করছেন। দেহে ফিরে পেলেন নতুন বল, ধুয়ে মুছে গেল সব ক্লান্তি। তাঁর ঘোড়াটাও যেন নতুন জীবন পেল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলেন ধর্মগুরু হিউ এন সাঙ। ক্লান্ত দেহে বালির ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলেন, এক ভীষণাকৃতি দানব যেন তাঁকে বলছে, 'নিষ্ঠার সঙ্গে না এগিয়ে ঘুমোচ্ছেন কেন?'

জেগে উঠে আবার অগ্রসর হলেন হিউ এন সাঙ। মাইল চারেক এগোবার পর তাঁর ঘোড়া হঠাৎ পথ পরিবর্তন করে জোর করে অন্য একদিকে নিয়ে গেল তাঁকে। বিস্মিত হয়ে হিউ এন সাঙ দেখলেন তিনি একটা মরূদ্যানে এসে পড়েছেন। ঘোড়া থেকে নেমে অঞ্জলি ভরে জল পান করলেন, গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম নিলেন। শীতল হল দেহ। এর দুদিন পরেই হিউ এন সাঙ মরু-ভূমির উত্তর-পূর্ব দিকের লোকালয়, ই-উতে পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছেই তাঁর পলায়ন পর্ব শেষ হল।

আংকোর বাট—অন্ধকার থেকে আলোয়

পৃথিবীর ইতিহাসে কত রাজবংশের উত্থান হল, পতনও হল। কিন্তু আজ যার নাম কাম্পুচিয়া, এককালের সেই কাম্বুজার খ্মের রাজবংশ নয় থেকে তের শতক পর্যন্ত ক্ষমতার শিখরে থাকার পর হঠাৎ যেমন করে হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অন্ধকারে তেমনটি আর কারও বেলা হয়নি। খ্মের রাজাদের সীমাহীন সব অতুল কীর্তিরও চিহ্নমাত্র পড়ে ছিলনা লোকচক্ষের সামনে। এর অন্যতম কারণ অতি অল্প সময়ে গজিয়ে ওঠা এক বিস্তৃত ও গহন অরণ্য তার সবটা গ্রাস করে ফেলে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত খ্মের সভ্যতার কোন নিদর্শন আবিষ্কারের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এই অরণ্যের দুর্ভেদ্যতার কারণে। রাজবংশের কীর্তি কাহিনীর কোন লিখিত দলিলও কোথাও কেউ রেখে যান নি। পরে অবশ্য পাওয়া যায় পাথরে খোদাই অসংখ্য শিলালিপি যা থেকে এই বংশের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়। কিন্তু যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখন সে সব জঙ্গলে মাটি চাপা পড়ে ছিল।

থেকে থেকে বিচিত্র সব গল্প চীনা ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মুখে শোনা যেত। ইউরোপের প্রত্নতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতদের কান পর্যন্ত তা পৌঁছলে তাঁরা মন দিয়ে শুনে সে সবের বিশ্বাসযোগ্যতা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতেন। পদ্মের আকৃতির একাধিক সুউচ্চ পাথরের স্তম্ভ নাকি একজনের চোখে পড়ে। জঙ্গলের গাছ পালার মাথা ছাড়িয়ে ওঠে যার চুড়া। আর একজন নাকি দেখতে পান এক মন্দিরের পাথরে বাঁধানো চত্বরে বাচ্চার সঙ্গে ক্রীড়ারত এক চিতা বাঘ। তৃতীয় একজনের নাকি দেখা ও আলাপ হয় কয়েকজন বৌদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে যাঁরা পূজা করেন এক খ্মের

রাজার সমাধিমন্দিরে। এসব গল্প বিজ্ঞজন কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু খ্মের রাজবংশ সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহল থেকেই যায়। অবশেষে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কাম্পুচিয়া (তখন ক্যাম্বোডিয়া) ফ্রান্সের দখলে এলে অনেক ফরাসী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সেখানকার রাজধানী প্নোম পেন-এ চলে আসেন। কয়েকজন মেকং নদী দিয়ে উজান বেয়ে চলে যান। কেউ কেউ পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকে যান, যেখানে চিতা বাঘ ও শঙ্খচূড় সাপের ভয় প্রতি পদে। কিন্তু ওখানকার ভ্যাপসা গরম সহ্য করতে না পেরে কিছুদিনের মাধ্যই তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এরপর ১৯৬০-এ আঁরি মুও (Henri Mouhot) নামে এক কীটতত্ত্ববিদ কয়েকটি বিরল জাতের প্রজাপতির সন্ধানে প্নোম পেন-এ আসেন। অরণ্যে প্রবেশ করে সোজা উত্তর মুখে চলতে থাকেন। একেবারে একা। সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরা এক থলে কাঁধে। আত্মরক্ষার অস্ত্র বলতে এক মরচে ধরা পিস্তল ও একটি কিরীচ। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অরণ্যে এর আগেও তিনি অনেক এসেছেন নানা জাতের কীটপতঙ্গের সন্ধানে। মাথার ওপর টিয়াপাখির টিটকিরি ও বানরের কিচির মিচির শুনতে শুনতে তিনি এগিয়ে চলেন। কিলবিল করে কালসাপ, গোক্ষুর সাপ প্রায় পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, কখনও ছোবল মারার ভয়ও দেখায়। ঘন ঝোপ-ঝাড় কিরীচ দিয়ে কেটে হাঁটার পথ তৈরি করতে হয়। দিনের পর দিন এত কষ্ট সার্থক করতেই যেন একদিন দেখা দেয় এক অদ্ভুত সুন্দর প্রজাপতি। তাঁর ঠিক সামনের গাছের ডালে একটি অর্কিডকে প্রদক্ষিণ করে উড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মুও জালটি বার করে ছুঁড়লেন, কিন্তু প্রজাপতি ধরা পড়ল না। উড়ে দূরে চলে গেল। মুও ছুটলেন তার পিছুপিছু। প্রজাপতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় তাঁর খেয়ালই হয়নি বনটা কখন ফাঁকা হয়ে এসেছে। গাছপালায় দৃষ্টি আটকাচ্ছে না তো! হঠাৎ দূরে

ওকি চোখে পড়ল? নিমেষে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন—সামনে এক বিশাল পাথরে তৈরি অট্টালিকা ও তার পাঁচটি অতি উঁচু পদ্মফুলের আকারের স্তম্ভ।

মুহূর্তের জন্য মুও প্রজাপতির কথা ভুলে গেলেন। চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। দুহাতে রগড়ে আবার তাকালেন। নাঃ, ঠিকই তো! দাঁড়িয়েই রয়েছে পাথরের সেই অপূর্ব স্থাপত্য। তখন ডাইনে তাকালেন, তারপর বাঁয়ে। দেখলেন, তিনি দাঁড়িয়ে এক প্রশস্ত রাজপথের মাঝখানে। পথের দুই পাশে দুই সারি পাথরের থাম, কোনটির মাথায় পাথরে খোদাই নাগ মূর্তি, কোনটিতে অন্য কোন অদ্ভুত আকৃতির জন্তুর। অবাক বিস্ময়ে ধীর পদে এগিয়ে গিয়ে পেঁছিলেন এক গড়ের কিনারায়। আগাছায় ছাওয়া গড়ের অগভীর জল অনেক কষ্টে পেরিয়ে উঁচু এক প্রাচীরের সামনে দাঁড়ালেন। একটু হেঁটে প্রবেশ পথ পেলেন। যেন এক সুড়ঙ্গ, এত পুরু সেই প্রাচীর। ভিতরে প্রকাণ্ড চত্বর। তার মাঝখানে মন্দির। আরও ভিতরে মন্দিরের গর্ভগৃহ। মুও চার দিকে ঘুরে দেখতে লাগলেন। মেঝেতে আবর্জনা, মাঝে মাঝে সিঁড়ি বেয়ে সাপ উঠছে, নামছে। মাথার উপর তাকাতে চোখে পড়ল একটি গ্যালারী। আরও দূরে অসংখ্য বাদুড় মাথা ঝুলিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এক অবর্ণনীয় মনের অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন মুও। ধীরে ধীরে সেই সব গল্প মনে পড়ল যা এককালে লোকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাহলে সত্যি সেসব গল্প যা চীনা ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মুখে শোনা গিয়েছিল। এখান থেকেই তাহলে খ্মের রাজারা শাসন করতেন। হঠাৎ তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মাথা নুইয়ে সেই সব অজানা দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানালেন, যেন নিরাপদে ফিরে গিয়ে তাঁর এই আবিষ্কারের সংবাদ পৃথিবীকে জানাতে পারেন। পরে তিনি লিখেছিলেন, আংকোর বাট মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল এ যেন অন্ত-

হীন অন্ধকার থেকে আলোয় আসা।

ফিরে আসার আগে মুও সেই বিশাল স্থাপত্যকীর্তিটি আর একবার ভাল করে দেখে নিলেন। অনেক কিছুই তার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল অরণ্যের অত্যাচারে। যেখানে সেখানে দেয়াল ফুঁড়ে উঠেছে অশ্বত্থ, বট। বাড়তে বাড়তে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে দেয়াল। সেসব অগ্রাহ্য করে আংকোর দাঁড়িয়েছিল মানুষের অমিত সৃষ্টিশক্তির এক অনন্য উদাহরণ হয়ে। দেয়াল থেকে পুরু শেওলার স্তর মুছে তুলে দিয়ে মুও দেখতে পান পাথরে অপূর্ব খোদাই-এর কাজ, অনেক শিলালিপি—যার পাঠোদ্ধার ছিল তাঁর ক্ষমতার বাইরে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদদের কাছে এসবের মূল্য তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলেন।

দেয়ালের বাইরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা হল গেরুয়া পরা কয়েক জন বৌদ্ধ ধর্মগুরুর সঙ্গে। তাঁরাও নাকি হঠাৎ এই তীর্থস্থানটি আবিষ্কার করে এখানে এসে বাস করছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এঁরা এলেন কাছেই সিয়েমরিপ নদীর তীরে কৃষিজীবীদের এক উপনিবেশে। চাষবাসের জন্য বন কেটে ক্ষেত করতে এসেই নাকি এদের চোখে পড়ে আংকোর বাট মন্দির। মুও এদের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিলেন। এখান থেকে কি করে গ্রেট লেক-এ পেঁছিতে হয়, যে গ্রেট লেক থেকে আবার যাওয়া যায় টোনলে স্যাপ নদীতে।

নদীপথে ফিরতে ফিরতে নৌকায় বসে মুও তাঁর এই আবিষ্কারের এক বিস্তৃত ও পূর্ণ বিবরণ লিখে ফেললেন। পুনোম পেন এ পেঁছেই তিনি তা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন। সেটি সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসে পাঠিয়ে দিলে সেখানেও সাড়া পড়ে যায়। ছ' মাসের মধ্যে একটি দল পুনোম পেন-এ চলে আসে। দলে ছিলেন অনেক বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ এবং সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কালবিলম্ব না করে তাঁরা নদীপথে আংকোর বাট-এর দিকে রওনা হলেন।

এঁরা সবাই ছিলেন তাঁদের নিজ নিজ কাজে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। ওই প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনটির হৃত গৌরব সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাঁরা কাজে লেগে গেলেন। দিবারাত্র তুলনাহীন নৈপুণ্যের সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তাঁদের কাজটি সম্পূর্ণ করতে করতে চল্লিশটি বছর পেরিয়ে যায়। মন্দির সংস্কারের কাজের মাঝখানে খোঁজ পাওয়া গেল দেয়ালের বাইরে চারপাশে মাটি চাপা পড়া গোটা শহরটির, আরও অনেক মন্দিরের ও খ্মের রাজ্যের আরও অনেক নগরের।

উদ্ধার করা সব শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও ভাষান্তর করা হল। তা থেকেই জানা গেল খ্মের রাজবংশের ইতিহাস। একের শতকে কাম্বুজার এলাকা জুড়ে ছিল অনেক ক'টি স্বাধীন রাষ্ট্র। এগুলির পুরোভাগে ছিল ফুনান, তখন এক সুন্দরী যুবতী রাণীর শাসনাধীনে। নাম ছিল তাঁর উইলোলীফ। ওই সময়েই ভারতে কৌণ্ডিন্য নামে এক ধনবান যুবক স্বপ্নে পান এক দেবাত্মার আদেশ—মন্দির থেকে একটি ধনুক ও কিছু তীর নিয়ে তিনি যেন পূবের উদ্দেশে সমুদ্রে পাড়ি দেন। সে আদেশ পালন করে কৌণ্ডিন্য ফুনানের উপকূলে পৌঁছলে রানী উইলোলীফ তাঁর রণতরী নিয়ে কৌণ্ডিন্যকে বাধা দেন। কৌণ্ডিন্য একটি তীর ছুঁড়ে সেই রণতরী ডুবিয়ে দেন, কিন্তু রাণীকে জল থেকে উদ্ধার করেন। এখানেই শুরু হয় তাঁদের প্রেম, যার পরিণতি বিবাহে। ফুনানে চলে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত শাসন। তাঁদের বংশধরেরা ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় এঁদের একজন, যাঁর নাম ছিল ভববর্মন, প্রতিবেশী রাজ্য চেনলার রাজার একমাত্র সন্তান ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিয়ে করেন। ভববর্মণ উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি চেনলার সিংহাসনটি অধিকার করেন, আবার ফুনানের রাজার মৃত্যু হলে সেখানকার সিংহাসনটিও দাবি করে বসেন। শেষ পর্যন্ত তা ছিনিয়েও নেন। এর পরের দুই শতাব্দী ধরে খ্মের বংশের

রাজারা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করে চলেন। এই বংশের প্রথম জয়-বর্মণের মৃত্যুর পর যিনি সিংহাসনে বসেন তিনি ছিলেন দাম্ভিক, আবেগপ্রবণ ও হঠকারী। সেই সময় গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালয়ের অধিপতি শৈলেন্দ্রর ভয়ে কাঁপত। এক মন্ত্রীর মুখে শৈলেন্দ্রর সাম্রাজ্যের আয়তন ও সম্পদের কথা শুনে একদিন সবার উপস্থিতিতে হঠাৎ বলে বসলেন, "আমার সামনে আমি দেখতে চাই একটি থালায় শৈলেন্দ্রর কাটা মুণ্ডু।" কথাটি শৈলেন্দ্রর কান পর্যন্ত পেঁছিতে দেরি হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তিনি চেনলা আক্রমণ করেন। রাজ্যের রাজধানীটি তছনছ করবার পর জয়বর্মণের শিরশ্ছেদ করে চেনলার সভাসদদের ডেকে বললেন রাজ্যের সব থেকে বুদ্ধিমান যুবকটিকে খুঁজে বার করে তাঁকে সিংহাসনে বসাতে। এ আদেশ পালিত হল। নতুন রাজাকে শৈলেন্দ্র রাজকার্য ও শাসন পদ্ধতি শেখাতে যবদ্বীপে নিয়ে গেলেন।

নতুন রাজা তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন। বছর দুই পর শিক্ষা শেষ হলে শৈলেন্দ্র তাঁকে তাঁর রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। যাবার সময় সঙ্গে দিয়ে দিলেন একটি থালায় জয়বর্মনের সংরক্ষিত ছিন্ন মুণ্ডটি। বলে দিলেন, শৈলেন্দ্রর আধিপত্য অস্বীকার করলে কি পরিণাম হতে পারে এটা দেখলেই মনে পড়বে।

নতুন খ্মের রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মণ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। দীর্ঘ ষাট বছর রাজত্ব করে দেশকে অনেক সমৃদ্ধশালী করে তুললেন। কলহপ্রবণ প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে দমন করে নিজের আয়ত্বে আনলেন। তাদের একত্রিত করে সমগ্র অঞ্চলটির নতুন নাম দিলেন কাম্বুজা। আংকোর বাট-এর কাছে নতুন রাজধানী গড়ে তুলে নাম দিলেন আংকোর থোম। এছাড়া আরও একটি নগর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মহা জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করতে থাকলেন। খ্মেরদের কাঠের বদলে ইট-পাথরের ব্যবহার তিনিই শেখান। স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের ওপর তিনি জোর দেন।

কৌণ্ডিন্যর আনা ভারতীয় প্রভাবের প্রমাণ এতেই পাওয়া যায়।

প্রৌঢ়ত্বে এসে তিনি শৈলেন্দ্রর আনুগত্য অস্বীকার করেন। প্রতিশোধের আশঙ্কায় আবার রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। এবারে উত্তরে প্নোম কুলেন পাহাড়ে। সেখানে এক দুর্গ-নগরীর প্রতিষ্ঠা করে নিরাপদ বোধ করলেন। এরপর ৮০২ সালে মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে খ্মেরদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কায়েম করে তাদের অমিত শক্তির অধিকারি করার আশায় যাদুবিদ্যায় পারদর্শী এক ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন। মন্ত্রবলেই হোক বা যে করেই হোক জয়বর্ধনের শক্তি বৃদ্ধি সত্যিই হয়েছিল। খ্মের রাজারা "দেবত্ব" লাভ করলেন। "দেবরাজ" বা 'রাজা-দেবতা'র পূজা খ্মের ধর্মের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। জয়বর্মণের জীবনকালেই খ্মের সাম্রজ্য থাইল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আজকের ভিয়েতনাম ও চীনের কিছু অংশও এর অধীনে চলে আসে।

বার্ধক্যে এসে দূর পাহাড়ে নিঃসঙ্গতার কারণে জয়বর্ধনের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। সমতলে নেমে এসে আবার তিনি এক নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন গ্রেটলেক-এর কাছে। নাম দিলেন তার হরিহরালয়। তিনি দেহত্যাগ করেন ৮৫০ সালে। এর পরের ১০০ বছর কাম্বুজা ওই বংশের যে রাজাদের শাসনে ছিল তাঁদের সবাই সুযোগ্য ছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের গুণের কথা শতগুণ অতি-রঞ্জিত করে লিখে গেছেন সমসাময়িক খোসামুদে লেখকেরা। যে কারণে তাঁদের প্রকৃত গুণ বিচার আজ আর সম্ভব নয়। এঁদেরই একজন তৃতীয় রাজেন্দ্রবর্মণ যশোধরপুর নামে নগরটির উন্নয়ন করে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোনার কাজ-করা বাড়ী-ঘরের দেয়াল ও থাম, মনি-মুক্তা খচিত প্রাসাদ ইত্যাদি। তাঁর মৃত্যু হয় ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে। এর পর থেকে ১১৫০ সাল পর্যন্ত আর যে কজন রাজা কাম্বুজার সিংহাসনে বসেছেন তাঁরা সবাই ছিলেন ভালমানুষ। ওই পর্যন্তই। কেউ বিরাট আকারের ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। শেষ রাজার মৃত্যু হয় ১১৫৫-তে। তার পর যাঁর

রাজা হবার কথা ছিল সেই জয়বর্মন ছিলেন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। তাঁর এক জ্ঞাতিভাই সিংহাসনের উপর দাবি জানালে তিনি তা নিয়ে লড়াইতে না নেমে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে যান। সিংহাসনে যিনি বসলেন রাজা হবার কোন যোগ্যতাই তাঁর ছিলনা। ফলে রাজ্যে নেমে এল রাজনৈতিক অস্থিরতা। পরিণামে হল তাঁর অকালমৃত্যু। তাঁর জায়গায় এলেন এক উচ্চাকাঙ্খী ভূঁইফোড়। নাম তাঁর ত্রিভুবনাদিত্যনারায়ণ। কাম্বুজার এক সামন্ত রাজ্য চাম্পার সঙ্গে তিনি সংঘর্ষে এলেন, ফলে সেই রাজ্য কাম্বুজা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে কাম্বুজার রাজধানী বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এ সংবাদ জয়বর্মণের কানে পোঁছুলে তিনি ছুটে আসেন। গোটা রাজ্যে, বিশেষ করে তাঁর প্রিয় নগর যশোধরপুরে ধ্বংসের ওই রূপ দেখে ধর্মপ্রাণ জয়বর্মণও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা নীতি পরিত্যাগ করে খ্মেরদের জাগিয়ে তুললেন। চাম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে তার রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে চাম্পার মানুষদের ক্রীতদাসের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন।

সপ্তম জয়বর্মণ ১১৮১তে রাজা হয়ে বসলেন, তাঁর বয়স তখন ৫০ এর বেশি, কিন্তু অফুরন্ত শক্তি, উৎসাহ। পূর্বসূরীদের মতই তিনি ছিলেন এক অক্লান্ত সংগঠক। বিধ্বস্ত রাজধানীটির পুনর্গঠনের কাজে অবিলম্বে হাত দিলেন। একই সঙ্গে আর একটি ছোট নগর স্থাপনের কাজে লোক লাগালেন। এর নাম দিলেন "প্রেয়া খান" বা জয়নগর। এছাড়াও আরও অনেক সুন্দর জনপদ তিনি গড়ে তোলেন, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি তাঁর আংকোর বাট মন্দিরের অদূরে বিধ্বস্ত আংকোর থোম মহানগরের পুনর্গঠন। এই জয়বর্মন প্রায় একশ বছর বেঁচেছিলেন। আজীবন তিনি প্রজাদের জন্য চিন্তা ও তাদের হিতসাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। দেশের সর্বত্র রাস্তা ও রাস্তার ধারে ধারে পর্যটকদের জন্য অতিথিশালা,বিশ্রামাগার তৈরি করিয়েছিলেন এবং চিকিৎসা-

কেন্দ্র, যার কথা সে সময় কারও চিন্তাতেও কখনও আসেনি। একটি নয় অনেক। তাঁর আমলে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সংখ্যা নেই। সবার জন্য এত কিছু করতে করতে এক সময় তাঁর মনে হল তিনি নিজেই বুদ্ধদেব। আংকোর থোম-এর প্রবেশদ্বারে একাধিক উঁচু স্তম্ভের উপর প্রতিটিতে রয়েছে অতিকায় মানুষের মুখমণ্ডলের ভাস্কর্য। সব তাঁরই মুখের আদলে। প্নোম পেন-এর যাদুঘরে আছে জোড়াসন ভঙ্গিতে বসা বাস্তব থেকে বহুগুণ বড় মাপের বিশাল এক ধ্যানমগ্ন মানুষের মূর্তি। সেটিও তাঁরই মূর্তি। মূর্তিটির পেশীবহুল শরীরাংশে অমিত শক্তির ইংগিত। আবার মুখমণ্ডলে গভীর আধ্যাত্মিক প্রশান্তি।

বলতে গেলে এঁর রাজত্বকালই খ্মের গৌরবের শেষ অধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ওই রাজবংশের পতন শুরু। যে যেদিক থেকে পারে এসে কাম্বুজার ধনসম্পদ লুটে পুটে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। বার বার আক্রমণ আসে থাইল্যাণ্ড থেকে। খ্মের কৃষিজীবীরা ধর্মের অনুশাসন মেনে নির্বাণের জন্য দারিদ্রের পথই বেছে নেয়। একের পর একটি প্রদেশ কাম্বুজা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৪৩০-এ থাইল্যাণ্ড দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে কাম্বুজা আক্রমণ করে। আবার বিধ্বস্ত হয় আংকোর থোম। এর অমূল্য সব সম্পদ থাইরা লুঠ করে নিয়ে যায়। খ্মের রাজসভা প্নোম পেন-এ স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে এ রাজবংশের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার এক ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। প্রজারা করের ভারে নুয়ে পড়ে। "দেব-রাজা" তে তাদের বিশ্বাস তখন আর নেই, তার প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দির নির্মাণেও নেই আগ্রহ। থাই-রা এর পর আও বেপরোয়া আক্রমণ চালাতে থাকে। তাদের দেখাদেখি অন্য প্রতিবেশীরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে খ্মের সাম্রাজ্য বিলুপ্তির পথে এগোতে থাকে, পেছনে রেখে যায় এর ইতিহাসবহনকারী কিছু শিলালিপি, যা দীর্ঘ ৫০০ বছর ধরে সমাধিস্থ ছিল গভীর অরণ্যে মাটির নীচে।

বছরের পর বছর এখানকার অসহ্য গরম উপেক্ষা করে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে পরিশ্রম করে গেছেন আংকোর বাট, আংকোর থোম ও অন্যান্য মন্দিরকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে আনতে, তা চিরকালের এক উদাহরণ হয়ে থাকবে।

প্রাচীনতম বাইবেল আবিষ্কার

১৯৪৭ সালের এক গ্রীষ্মের কথা। এক বেদুইন বালক, নাম তার মহম্মদ আ-ধিব (তার নামের অর্থটিও কিন্তু সাহসিকতাপূর্ণ অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ) তার একটি দলছুট ছাগলকে খুঁজতে ওয়াদি কুমরান চলে গিয়েছিল। এই ওয়াদি কুমরান আসলে জনশূন্য, নির্জন একটি দেশ, পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে মৃত সমুদ্রের তীরের পাশেই। একটি উঁচু চুনা পাথরের পাহাড়ের মুখোমুখি উঁচুতে অবস্থিত একটি গুহামুখ পর্যবেক্ষণ করেছিল আ-ধিব। গুহা-মুখে কোনো জন্তু লুকিয়ে আছে কিনা দেখার জন্য সে একটি পাথর ছুঁড়ে মারল গুহা লক্ষ্য করে। পাথরটির পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার শব্দের পরিবর্তে সে শুনতে পেল সেটি কোনো মাটির পাত্রে আঘাত কয়লো এবং পাত্রটি ভাঙার শব্দও সে পেল। সে আবার একটি পাথর ছুঁড়লো আবার একটি পাত্র ভাঙার শব্দ।

আশ্চর্য কাণ্ড! আ-ধিব জানতো এই এলাকা জনশূন্য। তার কৌতূহল বেড়ে গেল। সে সাহস অর্জন করল। তার নামের অর্থের মাহাত্ম্য তবে কি? হারানো ছাগলের কথা ভুলে গেল সেই বেদুইন বালক। চুনাপাথরের পাহাড়ের পার্শ্বদেশ বেয়ে উঠে গুহা-মুখে ঢোকার পথের কাছে এলো এবং ভিতরে উঁকি দিলো। বিস্মৃত হয়ে আ-ধিব দেখলো গুহার ভিতরটা বেলনাকার কল-সীতে পরিপূর্ণ। তার অনেকগুলি ভাঙা।

এবারে এই আ-ধিব অর্থাৎ নেকড়ে বালকের সাহস ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগল। ভয়ের শিহরণ খেলে গেল তার দেহে। এই জনশূন্য, পরিত্যক্ত স্থানে এতো কলসী কে রেখেছে? নিশ্চয় এসব

অশরীরী আত্মার কাণ্ড-কারখানা। আ-ধিব ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

যাযাবর সম্প্রদায়ের ছেলে আ-ধিব মরুদেশে তাঁবুতে বাস করে। সে তাঁবুতে ফিরে তার এক বন্ধুকে কলসীর গল্প বলল। বন্ধুটি ভূতের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, নিশ্চয় ওই কলসী-গুলি টাকা পয়সায় ভর্তি, এমন কি সোনার মুদ্রাও থাকতে পারে।

বন্ধুর কথায় উৎসাহিত হয়ে পরের দিন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নেকড়ে বালক আরও সাহস সঞ্চয় করে চললো জনহীন ওয়াদি কুমরান প্রান্তরে। কিন্তু কলসীগুলির কয়েকটি পরীক্ষা করে নিরাশ হলো ওরা। টাকা-পয়সার চিহ্ন কোথাও নেই। কিন্তু তারা এমন একটি জিনিস আবিষ্কার করলো যার মূল্য টাকা-পয়সার চেয়েও বেশী। তারা দেখলো কলসীগুলির ভিতর অনেক পুরোনো কাপড়ে মোড়া চামড়া ও প্যাপিরাস গোল করে গুটিয়ে রাখা আছে। এই দুই যাযাবর বালক এগুলির আসল মূল্য সম্পর্কে সচেতন না থাকলেও তাদের মনে হল প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে এগুলি মূল্যবান হতে পারে। এগুলি বিক্রি করে টাকা পাওয়া যেতে পারে। ওই রকম কয়েকটি মোড়ক বেছে নিয়ে, তারা তাঁবুতে ফিরে এলো। অবসর সময়ে তারা মোড়কগুলি পরীক্ষা করত। খুলতে গিয়ে কয়েকটি ছিঁড়েও গেল। কাপড়ের নীচে বাদামী চামড়ার মোড়ক। চেষ্টা করে একটা মোড়ক খুলেও ফেলল তারা। সবশেষে মোড়কে রয়েছে একটি প্যাপিরাসের পুঁথি। গোটানো পুঁথিটা খুলে তারা অবাক। তাঁবুর এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সেটি লম্বা।

এই পুঁথিগুলিতে কি লেখা আছে তারা বুঝতেও পারলো না এবং এগুলি যে কারোর প্রয়োজনে লাগতে পারে এটা তারা কল্প-নাও করতে পারল না। এরপর তারা যখন বেথলেহেমে গেল প্রতিদিনের মত দুধ আর পনির বিক্রি করতে সঙ্গে নিয়ে গেল ওই

পুঁথি। আ-ধিব দুধ বিক্রি করত এক সিরিয়া দেশীয় ব্যবসায়ী খলিল ইসকান্দার সাহিনের কাছে। তাকে সে পুঁথিগুলি দিতে চাইলো। খলিল সেগুলি দেখে বললো, এই চামড়াগুলি আমার জুতোর কারখানায় কাজে লাগবে। আ-ধিব পুঁথির মোড়কগুলি দিয়ে দিল ওই ব্যবসায়ীকে। খলিল বাড়ীতে ভালভাবে পুঁথিগুলি পর্যবেক্ষণ করলো। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী বুঝতে পারলো এগুলি নিশ্চয় কোনো পুরানিদর্শন। পুঁথিগুলো দেখালো সিরিয়া শহরের গীর্জার প্রধান যাজক স্যামুয়েল সাহেবকে। স্যামুয়েল পুঁথির লেখা দেখে বুঝতে পারলেন এটি হিব্রু ভাষায় লেখা। এই পুঁথির গুরুত্ব কতটুকু না বুঝেও তিনি এগুলি খলিলের কাছ থেকে কিনতে চাইলেন। তিনি ভাবলেন, এগুলি প্রাচীন সিরিয়ার পাণ্ডুলিপি হতে পারে। এদিকে খলিল বালক আ-ধিব-কে জেরা করে জানতে পারলো এরকম আরও অনেক পুঁথি ওয়াদি কুমরানের গুহায় আছে। খলিল তার এক সঙ্গীকে নিয়ে ওই গুহা থেকে বেশ কিছু পুঁথি নিয়ে এলো। এরপর যাজক স্যামু-য়েলও একটা অভিযান চালিয়ে গুহা থেকে বাকি সব পুঁথি নিয়ে চলে এলো। এই সব অভিযানই ছিল বে-আইনী। তারা অনেক পুঁথি নষ্টও করেছিল।

পুঁথিগুলি যাজক গোপনে রাখলো জেরুজালেমের সেণ্ট মার্ক মিশনারীতে। এরপর চেষ্টা চললো পুঁথির লিপি উদ্ধার করার। একজন পর্তুগীজ যাজক, তিনি আবার বাইবেল অধ্যাপক, পুঁথি পড়ে বললেন, এ পুঁথি মিশরীয় সভ্যতার প্রথম পুস্তক। ফ্রান্সের এক পুঁথি পর্যবেক্ষণ সংস্থা জেরুজালেমে তখন অবস্থান করছিল। তাঁরা মানতে চাইলেন না যে এ পুঁথি মিশর সভ্যতার। অতো প্রাচীন সভ্যতার পুঁথি এভাবে থাকতে পারে না। জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পুরাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ই. এল. সুকিনিক তখন সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। তিনি পুঁথি-গুলি ভাল করে পরীক্ষা করে চমৎকৃত ও বিস্মিত হলেন

পুঁথিগুলির প্রাচীনতা দেখে। পুরাতত্ত্বের ইতিহাসে এ পুঁথির গুরুত্ব অনেক। তিনি খলিলের কাছ থেকে পুঁথি কিনতে বেথে-লেহেমে চলে গেলেন।

এই সময়টাতে প্যালেস্টাইনও ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। সুতরাং জেরুজালেম থেকে বেথলেহেম যাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য। ১৯৪৭ সালের সারা বছর জুড়েই প্যালেস্টাইনের শাসনভারের আদেশ-প্রাপ্ত ব্রিটিশ সরকার, ইউরোপ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বন্যা রোধের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ইহুদীদের সশস্ত্র বিপ্লব তখন চল-ছিল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে। প্রত্যুত্তরে ইংরেজ মিলিটারী প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছিল। সুতরাং মৃত সাগরের পুঁথির এই রহস্যভেদে ব্যাঘাত ঘটলো। অধ্যাপকদের মাথার উপর দিয়েই বলা যায় বুলেট ছুটছে। পুঁথিরহস্য উদঘাটন রয়ে গেল অনিশ্চি-তের অন্ধকারে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর—যারা ওই সমস্ত পুরা আবিষ্কার রক্ষণাবেক্ষণ করেন তারাই এটা গোপন করে দিল।

পুরাতত্ত্ববিদ সুকিনিক বেথেলেহেমে গিয়ে খলিলের কাছ থেকে কয়েকটা পুঁথি কিনে নিয়ে এলেন।

এদিকে জেরুজালেমের রাস্তায় যখন আরবীয় ও ইহুদীদের লড়াই চলছে। তখনও যাজক স্যামুয়েল পুঁথিগুলির গুরত্ব ও মূল্যনির্ণয়ের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সময় তিনি জেরু-জালেমের আমেরিকান স্কুল অব্ ওরিয়েন্টাল রিসার্চের প্রধান ডঃ জন.সি. ট্রেভেরের সংস্পর্শে আসেন। ডঃ ট্রেভের যাজক স্যামুয়েল-কে সত্যি কথা গোপন করে গেলেন। পরীক্ষার পর তিনি বুঝতে পারলেন, এই পুঁথিগুলি অদ্যাবধি আবিস্কৃত বাইবেলের থেকেও পুরোনো বাইবেল। তিনি এই পুঁথিগুলির ছবি নিলেন। বালির বস্তায় এই ফটো কপিগুলি ভরে সেই যুদ্ধ-অশান্ত জেরু-জালেম থেকে পুঁথি পাঠানো হলো এয়ার মেলে আমেরিকার বাল্টিমোরে অধ্যাপক ডব্লিই. এফ. অল্ ব্রাইটের কাছে। তিনি বাইবেল সম্পর্কিত পুরতত্ত্ববিদ। তিনি বললেন, আধুনিক সময়ের

সবচেয়ে মহান পুঁথি আবিষ্কার এটি। তাঁর বিবরণ প্রকাশিত হল 'আমেরিকান্ স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ' সংস্থার বুলেটিনে, ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে। পুঁথিবিদ্‌দের মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল।

এদিকে জর্ডন, আরব ও প্যালেস্টাইনের প্রাচীন পুরাতত্ত্ব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত মিঃ জিরাল্ড এল হার্ডিং মুশকিলে পড়ে গেলেন। তিনি প্রথম প্রথম এই পুঁথির ব্যাপারে গুরুত্বই দেন নি! তাঁর নাকের ডগা দিয়ে পুঁথিগুলি একের পর এক হাত বদল হলো। এদিকে যাজক স্যামুয়েল প্রচুর পুঁথি চালান করে দিয়েছেন আমেরিকার বাইরে।

সরকারী চাপে বেকায়দায় পড়ে হার্ডিং তদন্ত শুরু করলেন পুরো ব্যাপারটার। জেরুজালেমে তখন গৃহযুদ্ধ চলেছে। তিনি বললেন, পুঁথিগুলি সযত্নেই আছে। কিন্তু কোথায়? ইতিমধ্যে কিছু আনাড়ী লোক, যারা এই পুঁথিগুলি গুহা থেকে উদ্ধার করেছিল তারা, পুঁথিগুলির যা ক্ষতি করার তা করে ফেলেছে।

হার্ডিং প্যালেস্টাইনের পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক যোসেফ সাডকে পুরো ঘটনার তদন্তের ভার দিলেন। যাজক স্যামুয়েল তখনও আমেরিকার বাইরে পুঁথিগুলির বিনিময়ে অনেক টাকা পাবার আশায় বসে আছেন। সাড, সেণ্ট মার্ক মনাস্টারি, আমেরিকান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল রিসার্চ সর্বত্র খোঁজ করে ব্যর্থ হলেন। শেষে তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেই মৃত সমুদ্রের তীরবর্তী গুহায় একটি অভিযান পরিচালনা করলেন। এটা ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনা। যোসেফ সাড ভাঙা চোরা কলসী গুলি দেখে বুঝলেন আনাড়ী মানুষগুলো কি ক্ষতি করেছে। চারিদিকে ভাঙা কলসী, ছেঁড়া পুঁথি। এর মধ্যে তিনি পেলেন একটি সিগারেট রাখার বাক্স। তাতে নাম লেখা মালিকের, জাবরা। অনেক খুঁজে তিনি জাবরাকে বার করলেন। আর তার কাছ থেকে জানতে পারলেন সিরিয়ার ব্যবসায়ী খলিলের

কথা। জেরুজালেম তখন অশান্ত। সব মানুষই সশস্ত্র থাকে। খলিলও তার গোষ্ঠীর লোকজনদের নিয়ে সশস্ত্র হয়ে থাকে সব সময়, খবর পেলেন সাড। নির্ভীক সাড খলিলের সঙ্গে দেখা করে অর্থের বিনিময়ে উদ্ধার করলেন পুঁথিগুলি। পুঁথিগুলি লেখা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে। এগুলি ওল্ড টেস্টামেন্টের অংশবিশেষ। আমরা বর্তমানে যে ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুবাদ করে পড়তে পাচ্ছি এগুলি তার থেকেও এক হাজার বছর আগে লেখা।

সেই লোভী বিশপ স্যামুয়েলকে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল তার অন্যায় কাজের জন্য। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। সে বললো যখন সে পুঁথিগুলি নিয়ে জেরুজালেম ত্যাগ করেছিলো তখন ব্রিটিশ শাসন শেষ হয়েছে তাই সে আইনের আয়তায় পড়ছে না। এক বছর ধরে টানা হেঁচড়া চললো এই নিয়ে। স্যামুয়েলের কাছ থেকে আমেরিকান স্কুল এগুলি কেনার জন্যেও জেদী হয়ে পড়েছিলো। অবশেষে পুঁথিগুলি শেষ বিশ্রাম পেল জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়েই।

তুষারমানব ইয়েতির সন্ধানে

হিমালয়ের তুষারে ঢাকা উচ্চতায় জন্তুটির বিচরন—এরকমই শোনা যায়। স্থানীয় শেরপাদের ভাষায় এর যা নাম সেটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে হয় 'Snowman', বাংলায় বলা যেতে পারে 'তুষারমানব'। এর একটি বিশেষণও আছে, সেটি নিলে ইংরেজিতে নামটি হয় 'Abominable Snowman', বাংলাতে কি হতে পারে সে প্রশ্ন এখন থাক। এই রচনার জন্য আমরা তার তিব্বতী নামটিই ব্যবহার করব, যা হল 'ইয়েতি'।

কিন্তু কি নামে ডাকব তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হল, জন্তুটি আদৌ আছে কি? যদি থেকেই থাকে তবে তার সঙ্গে মানুষের কতটা মিল, যে কারণে নামে man শব্দটি স্থান পেয়েছে? হিমালয়পর্বতের দুর্লঙ্ঘ গিরিশিখরগুলির প্রায় সব কটিতেই মানুষ পা রাখতে পেরেছে। কিন্তু ওই সব অঞ্চলের সবার মুখে যার কথা শোনা যায় সেই ইয়েতি বা স্নোম্যানের রহস্য আজও রহস্যই রয়ে গেছে। স্কটল্যান্ড-এর নেস হ্রদের দানব (Loch Ness Monster) বা আকাশের উড়ন্ত রেকাবি (Flying Saucer)-এর মত।

বহু শতাব্দী ধরেই ভূপর্যটকেরা শুনিয়ে এসেছেন এই স্নো-ম্যানের কথা। একে প্রথম গুরুত্ব দেওয়া হয় ১৯২১ সালে যখন ইতিহাসের প্রথম এভারেস্ট অভিযাত্রীদের নজরে আসে তুষারের উপর কিছু পায়ের ছাপ যা স্নোম্যানের বলে দাবি করা হয়। এর-পর ১৯৫১তে এরিক শিপটনএই পদচিহ্নের কয়েকটি ফোটো নেন। ফোটো দেখে অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেছিলেন পায়ের ছাপ-গুলি মনুষ্যাকৃতি কোন বড় মাপের জন্তুর। উঁচু পাহাড়ে যাদের বাস। এর পরই স্নোম্যানের কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেকেই তার সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তাকে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। উচ্চতায় ইয়েতি মানুষের সমান সমান, মাথার খুলি একটু ছুঁচলো, লালচে চুলে ঢাকা, এই রকম। কেউ বলতে থাকেন ইয়েতি যাথায় ১২ ফুট, মুখের আদল মানুষ আর গরিলার মাঝামাঝি। প্রচণ্ড বেগে তুষারের উপর দিয়ে ছুটে চলে। শেরপাদের মতে ওদের পায়ের পাতা উল্টোমুখি, আঙ্গুল-গুলি গোড়ালি থেকে বেরোনো। যার ফলে এরা খাড়া পাহাড় বেয়ে খুব চটপট উঠে যেতে পারে। কারও বিবরণ অনুযায়ী ইয়েতির গায়ের চামড়া সাদা লোমহীন, লম্বা কটা চুল, হাতে মুগুর ইত্যাদি।

ইয়েতির পদচিহ্ন বলে বর্ণিত বস্তুটি অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিই স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন লর্ড হাণ্ট ও এরিক শিপটন। ১৯৫১তে মেনলুং হিমবাহ-তে ১২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা ও ৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি চওড়া ইয়েতির পায়ের ছাপের ছবি তোলা হয়। ছাপগুলি দেখা গেছে ২১,০০০ ফুট উচ্চতায়।

স্নোম্যানের খোঁজে বের হওয়া এক দুঃসাহসিক অভিযান। হিমালয়ের আকাশচুম্বী উচ্চতায় অশেষ কষ্ট সহ্য করে কি পাওয়া যায়? বড়জোর ইয়েতি নিয়ে কিছু বিচিত্র গল্প ও কিংবদন্তী। ভীতিপ্রদ আধা মানুষ আধা দানব এই জন্তুটিকে নিয়ে কত জাতের আদিবাসীদের রয়েছে কত লোকসাহিত্য। ওদেত চেরনিন নামে জনৈকা লেখিকার একটি বই "The Snowman and Company" —এতে দু হাজার বছর ধরে স্নোম্যান সম্বন্ধে যতকিছু জানা গেছে বা বলা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, তিব্বতীদের ভাষায় লেখা এক প্রাচীন পুঁথিতে আছে যে, বানর রাজ এক পাহাড়ী দানবীকে ভালবেসে বিয়ে করে। তাদের যে সন্তানাদি হয় তারাই আজকের তিব্বতীদের পূর্বপুরুষ। এদের স্মৃতিই আজকের তিব্বতীদের মনে স্নোম্যান রূপ নিয়ে বেঁচে আছে।

তিব্বতীরা আজও বিশ্বাস করে যে, ইয়েতিরা সুন্দরী মানবীর প্রতি আসক্ত। বহু গ্রাম থেকে তারা তিব্বতী মেয়েদের নিয়ে চলে গেছে তাদের জীবন সঙ্গিনী করে। এসব মেয়েদের আর দেখা যায় নি। অনেকের ধারণা মেয়ে-ইয়েতিরা এদের হত্যা করেছে। এমন অসংখ্য গল্প মুখে মুখে চালু রয়েছে।

এক নেপালি লামার মেয়ের মুখে শোনা তার বান্ধবীর কথা শ্রীমতী চেরনিন তাঁর বইটিতে লিখেছেন। বহু বছর আগে ওই বান্ধবীকে এক ইয়েতি নিয়ে চলে যায়। ওকে আর দেখা যায়নি। নেপালি লামার মেয়েটির মতে ইয়েতিদের এই মেয়ে নিয়ে তাদের পার্বত্য আবাসে চলে যাওয়া একটা রীতি। এক শেরপার মেয়ের কথা সে জানে, যাকে লালচে চুলে ঢাকা ছুঁচলো মাথার খুলি-ওয়ালা এক ইয়েতি 'কিডন্যাপ' করে নিয়ে গেছে।

বইটিতে মীরা বেন বর্ণিত একটি কাহিনীও আছে। ঘটনাস্থল কাশ্মীর। সেখানে কয়েকজন মেষপালক তাদের সমাজের একটি মেয়েকে নাকি ইয়েতির হাত থেকে উদ্ধার করে। মেয়েটিকে নিয়ে এক ইয়েতি তার গুহায় চলে যায়। মেষপালকেরা পরে সেখানে গিয়ে সেই ইয়েতিকে হত্যা করে। এ সম্বন্ধে তারা ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানায়নি। কারণ ইয়েতি হত্যা তাদের আইনে নরহত্যা। দণ্ডনীয় অপরাধ। এসব নাকি মীরা বেন তাদের মুখেই শুনেছেন।

এই সব বহু প্রচারিত গল্পের ভিত্তিতেই পশ্চিমী দুনিয়ার অনেক গবেষক ইয়েতি বিষয়ক প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সবার মুখেই ইয়েতির আকৃতির এক রকম বর্ণনা এর অন্যতম কারণ—দীর্ঘকায়, লালচে চুল, আধা-বানর, সারা শরীরে ফিকে হলুদ জটা পাকানো লোম, পায়ের পাতার পিছন দিকে আঙুল।

ওদেত চেরনিনের বই থেকে জানা যায় ইয়েতিদের বিচরণ-ভূমির বিস্তৃত পরিধির কথা। রাশিয়ার পশ্চিম অঞ্চল থেকে তিব্বত, সাইবেরিয়ার পর্বত মালা থেকে আমেরিকার আলাস্কা,

সেখান থেকে রকি মাউণ্টেন। ইয়েতি দেখা গেছে একদা ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়। দেখা গেছে ক্যালিফোর্ণিয়ার উত্তর ভাগে, যেখানে তার নাম 'বিগ ফুট'। এসব শোনা কথায় লোকের বিশ্বাস না থাকলেও এভারেস্ট অভিনেত্রী এরিক শিপটনের তোলা স্নোম্যানের পায়ের ছাপের ফোটো, উইলফ্রিড নয়েস ও লর্ড হান্ট-এর নিজের কানে শোনা স্নোম্যানের শিস্ উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বরং এসব খবর রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে সত্য উদঘাটনের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া এ থেকেই শুরু হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি, ১৯৬০ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত—যেটির নেতৃত্ব দেন প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ী স্যার এডমন্ড হিলারি। এ উদ্যোগে সহায়তা দেয় শিকাগোর ওয়ার্লড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া।

এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল ইয়েতি আছে কি নেই তা জানা। যদি থাকে তবে সম্ভব হলে অন্তত একটিকে ধরা। ইয়েতি আছে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে নেপাল সরকার ইয়েতি হত্যা নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারি করলেন। হিলারি আশা করেছিলেন বন্দুক থেকে ঘুমপাড়ানি ওষুধের গুলি ছুঁড়ে ইয়েতি ধরবেন।

যাত্রা শুরু হয় কাঠমাণ্ডু থেকে। জঙ্গল, উপত্যকা পেরিয়ে বরফের রাজ্যে পৌঁছে সেখান থেকে ইয়েতির কথা স্থানীয় লোকেদের মুখ থেকে শুনতে শুনতে অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলেন। তিন রকম ইয়েতি নাকি আছে। অতিকায় ইয়েতি, অনেকটা ভালুকের মত ঘন লোমে ঢাকা ; মাঝারি মাপের বেজায় মোটা মানুষের মত, মাথায় লালচে চুল, ছুঁচলো খুলি—এরা নাকি মানুষখেকো ; তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের, থাকে হিমালয়ের বনাঞ্চলে, বানরের সঙ্গেই যার বেশি মিল।

ইয়েতির খোঁজে বেরোলে স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। এরা ইয়েতির গায়ের ও মাথার খুলির চুলসমেত চামড়া অভিযাত্রীদের দেখায়। হিলারিকেও তারা এসব দিতে চায়। অবশ্য দামের বদলে। হিলারির দল ৩০০ টাকা দিয়ে একটি

মাথার চামড়া কিনে নেয়। পরে অবশ্য দেখা যায় ওটি একটি তিব্বতী নীল ভালুকের।

প্রথম ইয়েতির পায়ের ছাপ হিলারির দলের নজরে পড়ে ১৮,০০০ ফুট উচ্চতায়, তিব্বতের সীমানায় রিপিমু হিমবাহে। প্রথম দৃষ্টিতে এটিকে বড় সড় এক মানুষের খালি পায়ের ছাপ বলে মনে হয়। দলের অনেকেই একে ইয়েতির পায়ের ছাপ বলে মেনে নিতে পারেননি, যদিও কয়েকটি ছাপে আঙ্গুল গোড়ালির দিকে বলেই মনে হয়। ওই একই হিমবাহের ১৮,৪০০ ফুট উচ্চতায় দুদিন পরে আবার কিছু ছাপ দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি নিঃসন্দেহে অন্য কোন জানোয়ারের, যা রোদ পড়ায় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। বরফের উপর এইরকম পায়ের ছাপই সর্বত্র পড়ে থাকে অনভিজ্ঞ চোখ যা ইয়েতির বলেই ধরে নেবে, বিশেষ করে কান যা শুনেছে তার প্রভাবে।

অভিযাত্রীরা এগোতে এগোতে এভারেস্ট-এর সোজা দক্ষিণে ইয়েতি রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু সোলু ক্মুম্বুতে পেঁাছলেন। এরপর ১৯,০০০ ফুট উচ্চতায় তাসি লাপচা গিরিপথটি পার হতে তাদের জান বেরিয়ে যায়। শুধু ভরা গ্রীষ্মেই এই পথে পা রাখা সম্ভব, আর তখন অক্টোবরের শেষ। পৃথিবীর সব থেকে দুর্গম গিরিপথ হিসাবেই তাসি লাপচার কুখ্যাতি। এই বিপদশঙ্কুল পথের প্রান্তে এসে তাঁরা কি দেখলেন? ইয়েতি নয়, এক পাল ছাগল আর ইয়াক, তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের জনা ছয় পালক। এর পর আর ইয়েতি অভিযানে কারও উৎসাহ থাকতে পারে?

রেডিওর মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে বাধা পেতে তাঁদের ধারণা হল চীন থেকে তাঁদের বেতার তরঙ্গ অকেজো করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে কি চীনের মানুষ তাঁদের গুপ্তচর বলে ধরে নিয়েছে? ভুল ভাঙ্গল কয়েক দিন পর, যখন দূরে তিব্বতের পর্বতশ্রেণীর ওপার থেকে একটা চীনা রকেট আকাশে উঠল ও তার পরই বেতার তরঙ্গ বাধামুক্ত হল। বোঝা গেল

বাধাটা আসছিল রকেট পাঠাবার যন্ত্রগুলি থেকে।

শেরপাদের গ্রাম খুমজুঙ্গ-এ পেঁছিলে অভিযাত্রীদের একটি চুলওয়ালা মাথার খুলির চামড়া দেখানো হয়। বলা হয় এটি ইয়েতির। সযত্নে রক্ষিত ছিল স্থানীয় মঠে সন্ন্যাসীদের কাছে। চামড়াটির বয়স অনেক, দেখে মনে হয় কোন মনুষ্যাকৃতি জীবের। চুলগুলি লম্বা। হিলারি ও তাঁর সঙ্গীরা এটি সম্বন্ধে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গ্রামের বৃদ্ধরা তখন ওই চামড়ার উৎস ও খুমজুঙ্গ-এর ইয়েতি পুরাণ নিয়ে গল্প ফেঁদে বসলেন। দুশ বছর আগে ওই জেলা ইয়েতিতে ভরে গিয়েছিল। ওরা খুমজুঙ্গ-এর ভাল ভাল মানুষদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই মানুষের চেয়ে ইয়েতির সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। তখন এক লামা ভাবতে বসেন কি করে ইয়েতিদের বংশ ধ্বংস করা যায়। মাথায় বুদ্ধিও এসে গেল। ইয়েতিরা অনুকরণ প্রবণ। মানুষকে যা করতে দেখে তাই করে। চতুর লামা সব গ্রামবাসীদের ডেকে এনে বসালেন, প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন মদের হাঁড়ি। হাঁড়িতে কি ছিল তা পরে দেখা যাবে। লামার নির্দেশে সবাই চুমুক দিয়ে ভর্তি হাঁড়িগুলি ফাঁক করে দিল। তারপর নেশায় চুর হ'য়ে হাতে তলোয়ার নিয়ে লড়াই শুরু করে দিল। কাটাকাটি করে সবাই মরে পড়ে থাকল। দূর থেকে ইয়েতিরা সব দেখল। তাপর রাতে ঘরে ঘরে ঢুকে মদের হাঁড়ি বার করে নিয়ে গ্রামবাসীদের ঠিক যা করতে দেখেছিল তাই করতে শুরু করে দিল। মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে লড়াই করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই মারা পড়ল। শেষ ইয়েতিটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব মৃত গ্রামবাসীরা যেন পুর্ণজন্ম পেয়ে উঠে দাঁড়াল।

আসলে যা হয়েছিল তা এই ঃ গ্রামবাসীদের মদের হাঁড়িতে ছিল জল, তলোয়ারগুলি ছিল কাঠের। নেশা, লড়াই ও মৃত্যু সব অভিনয়। ইয়েতিদের হাঁড়িতে রাখা ছিল নির্জলা কড়া মদ

আর ধারালো ইস্পাতের তলোয়ার। অতএব অনুকরণপ্রিয় ইয়েতিদের কি হল এরপর আর বলে দিতেহবে না। এদেরই এক-জনের মাথার খুলি থেকে চুলসমেত চামড়া খুলে নেওয়া হয়েছিল, সেটাই নাকি হিলারির দলকে দেওয়া হয়েছে।

গলপটা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করেননি।

খুমজুঙ্গ থেকে অভিযাত্রীরা চলে এলেন থিরাংবোচ-এ। এখান থেকে এভারেস্ট-এর যে রূপ চোখে পরে তার সৌন্দর্য অতুলনীয়, অবর্ণনীয়। জায়গাটি ইয়েতি রহস্যে ভরা। এখানকার লামাদের বক্তব্য, ইয়েতির সঙ্গে সহাবস্থানে তাঁরা অভ্যস্ত। প্রয়োজনে ঢাক-ঢোল, সিঙ্গা বাজিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। জঙ্গলের ভিতরে ফাঁকা জায়গা পেলে সেখানে ইয়েতিরা লামাদের চোখের সামনে খেলা করে। এর মধ্যে এক ইয়েতি থিয়াংবোচ থেকে অনেক মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে। এসব শুনে এখানে ইয়েতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাবে এই আশায় অভিযাত্রীরা প্রশ্ন শুরু করলেন। প্রথম প্রশ্ন লামাদের মধ্যে কে দেখেছেল ইয়েতি। হায়, কেউ না। সবাই শুধু শুনেছেন ইয়েতির কথা। দু'একজন নাকি ইয়েতির ডাকও শুনেছেন। ওই পর্যন্তই। তবে হাঁ, তাঁদের বাবা ঠাকুরদারা দেখেছেন একেবারে স্বচক্ষে।

খুমজুঙ্গ-এ ফিরে গিয়ে অভিযাত্রীরা ইয়েতির খুলির চামড়া ইউরোপ-আমেরিকায় নিয়ে যাবার অনুমতি চাইলেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য। অনেক আলোচনার পর স্থির হল ছয় সপ্তাহ চামড়াটি অভিযাত্রীরা রাখতে পারবেন। বিনিময়ে তাঁরা খুমজুঙ্গ-এর বৌদ্ধ মন্দিরটির সংস্কারের জন্য আট হাজার টাকা দিতে রাজী হলেন। এই ছয় সপ্তাহ একজন বয়স্ক গ্রামবাসী সারাক্ষণ তাঁদের সঙ্গে থাকবেন, যেখানেই তারা যান না কেন। তাঁর সব খরচ বহন করবেন অভিযাত্রী দল। এই বয়স্ক গ্রামবাসীর নাম খুঞ্জো চুম্বি।

চামড়াটি নিয়ে অভিযাত্রী দল পৃথিবী ঘুরলেন সত্যের সন্ধানে

দলে ছিলেন হিলারি, প্রাণীতত্ত্ববিদ মার্টিন পারকিনস ও সাংবাদিক ডেসমন্ড ডোয়েগ। এবং অবশ্যই খুঞ্জো চুম্বি। বেশ কিছুদিন সারা পৃথিবীতে খবরের কাগজের শিরোনাম যোগাল এই অভিযান। শিকাগোতে ইয়েতির মাথার চামড়া ও চুম্বির কথা সবার মুখে মুখে, যখন বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা তাঁদের হাতে নেন। চামড়াটি পরে প্যারিসে পাঠান হয়। সেখান থেকে লণ্ডনে, রয়াল জুলজিক্যাল সোসাইটিতে। সব জায়গায় সব কটি পরীক্ষার পর একটিই সিদ্ধান্ত ঃ চামড়াটি ভূয়া। যদিও এর বয়স যা দাবি করা হয়েছিল তাই। কিন্তু এটি যে জানোয়ারের সেটি এক জাতের হরিণ যা এশিয়াতে দেখা যায়।

চামড়াটি যথা সময়ে যথা স্থানে ফেরত দেওয়া হয়। পরীক্ষায় যা পাওয়া গেল তাতে কারও কিছু এসে যায়নি। তবে গোটা অভিযানটি হিলারি উপভোগ করেছেন। ইয়েতি দেখেছেন এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান অভিযাত্রীরা পাননি। ইয়েতির অস্তিত্ব শুধু শেরপাদের কল্পনায়, এটাই তাদের শেষ কথা।

মাচু পিচু আবিষ্কার

জুলাই মাসের এক ঠাণ্ডা বৃষ্টিঝরা সকাল। টিপটিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী পিছল পথে চলেছেন এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। মনে তার প্রাচীন এক সভ্যতা আবিষ্কারের অদম্য জেদ। বহুদিন ধরেই এই আবিষ্কারের নেশা তাকে চেপে ধরেছে। তাঁর এই অভিযানে অনেকে প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ী পথের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ফিরে গেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত বিংহাম একাই শুধু তাঁর গাইডকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

যাত্রা শুরু করেও বিংহামের মনে মনে আশঙ্কা থেকেই গেল। খুঁজে পাবেন তো প্রাচীন ইন্‌কা সভ্যতার নিদর্শন? পূরণ হবে তো তাঁর মনের অদম্য বাসনা? গাইড জানালো ধ্বংসস্তূপ পেতে গেলে পাহাড়ের আরও অনেক ওপরে উঠতে হবে। কিন্তু অত উঁচুতে উঠেও যদি ব্যর্থ হতে হয় তাহলে তার চাইতে কষ্ট আর কিছুই নেই। অথচ আমেরিকা থেকে তিনি পেরুতে এসেছেন, শুধু এই আবিষ্কারের জন্যই। এইসব শঙ্কা মনে নিয়েই চলেছেন। বিংহামের গাইড ক্যারাকাসকো ছাড়াও পথে আর একজন পথ-নির্দেশককে পাওয়া গেছে। সে পাহাড়ী নদী উরুবাস্‌বার পাড় ধরে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এবার এল ওই ভয়ঙ্কর নদী পেরনোর পালা। নীচে নদীর স্রোত ঘূর্ণীর মত ঘুরে চলেছে। ওপরে সরু গাছের ডাল দিয়ে আদিম পদ্ধতিতে পাহাড়ী মানুষের তৈরি এক সেতু—যেটি দিয়ে ওই নদী পেরোতে হবে। একবার পা ফস্‌কে নদীর ঘূর্ণীতে পড়ে গেলে পাথরে শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে বিংহাম ও সঙ্গীরা সেতু পেরিয়ে

ওপরে পেঁছলেন। এরপর তাদের উঠতে হবে খাড়াই পাহাড়ে। পেরুর এই অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি। দুর্গম এই পাহাড়ী অঞ্চলটি সমুদ্র থেকে প্রায় দশহাজার ফুট উঁচুতে।

পেছল ওই খাড়াই পাহাড় বেয়ে অসহ্য কষ্ট আর ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা ওপরে উঠে এলেন। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তাদের এই ঝুঁকিবহুল চড়াই ভাঙতে হয়েছে। তারা তখন বিধ্বস্ত ক্লান্ত। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে গেছে। হঠাৎই তাদের সামনে লাউয়ের খোলে করে খাবার ঠাণ্ডা জল নিয়ে হাজির হল দুজন রেড ইণ্ডিয়ান। বিংহাম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ঘন জঙ্গলে ঘেরা এত উঁচু পাহাড়ে কেউ কি বাস করতে পারে ?

বিস্মিত বিংহামের প্রশ্নের উত্তরে তারা জানাল যে তারা চাষী। এই পাহাড়ের ওপর তারা চাষের উর্বরা জমি খুঁজে পেয়ে এখানেই চাষ করে দীর্ঘদিন বসবাস করছে। রেড ইণ্ডিয়ান চাষীরা এটাও জানাল, এই পাহাড়ে চাষের এই জমি তাদের অনেক আগেই কেউ প্রস্তুত করে ফসল ফলিয়ে গেছে। চাষীরা বিংহামকে পাহাড়ে ধাপ কেটে কেটে অনেকদিন আগে তৈরি সেইসব চাষের জমি দেখাল। অভিজ্ঞ বিংহাম দেখেই বুঝতে পারলেন এ এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। এ নিশ্চয় 'ইন্‌কা' জাতির মানুষের তৈরি ফসলক্ষেত্র। আশার আলো তার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল। তার পরিশ্রম হয়ত সফল হতে চলেছে।

সেখান থেকে তারা আরও এগিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। হঠাৎই বিংহাম একটি দেওয়ালে ধাক্কা খেলেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন এক বিরাট বিশাল ধ্বংসস্তূপের মাঝে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পড়ে থেকে এর গায়ে শেওলা ও গাছ জন্মে পুরো ঢাকা পড়ে যাওয়ায় প্রথমে বোঝাই যায়নি কি সম্পদ এর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাথরের গায়ে অসাধারণ কাজ দেখে বিংহাম বুঝলেন তাঁর ইপ্সিত ধন তিনি পেয়ে গেছেন। এই সেই ইন্‌কা

সভ্যতার স্মৃতি চিহ্ন। পৃথিবীর উন্নত প্রাচীন সভ্যতাগুলির অন্যতম। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিংহাম ধ্বংসস্তূপের একটি গুহায় প্রবেশ করলেন। সেখানে ঢুকে তিনি দেখলেন পাহাড় কেটে কেটে অদ্ভুত দক্ষ হাতে অর্ধবৃত্তাকারে এক সুন্দর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বিংহামের আর কোন সন্দেহই রইল না যে এটিই সেই প্রাচীন ইন্‌কা সভ্যতার নিদর্শন।

এভাবেই ১৯১১ সালের জুলাই মাসের একটি দিনে হঠাৎ আবিষ্কৃত হল বহু আলোচিত ইন্‌কা সভ্যতা। আবিষ্কারক বিংহাম এর নাম দিয়েছিলেন 'মাচু পিচু', যার অর্থ হল 'বৃহৎ শিখর'। বিংহামের এই আবিষ্কার পেরুর প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। পেরুর 'ইন্‌কা' সভ্যতার কথা সবাই জানলেও এতদিন ধারণা ছিল এই সভ্যতার কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ স্প্যানিশ হানাদারেরা এই সভ্যতা ও তার সমস্ত নিদর্শনই ধ্বংস করে দিয়েছিল। কিন্তু বিংহামের এই আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হল যে ইন্‌কা সভ্যতার এতবড় নিদর্শন এতদিন লুকিয়ে ছিল জনচক্ষুর আড়ালে।

এই ইন্‌কা সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীন উন্নত সভ্যতাগুলির একটি। ইনকারা ছিল এক বৃহৎ জাতি। তারা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কুইচা উপজাতির মানুষ। খ্রীঃ পূঃ ১২০০ শতাব্দীতে এই সভ্যতার প্রথম রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা এই সভ্যতার শুরু আরও অনেক হাজার বছর আগে। ইন্‌কা শব্দের অর্থ রাজা। পরে এই নামেই গোটা জাতি চিহ্নিত হয়। প্রথম রাজার 'কুজকো' নামক স্থানে রাজধানী ছিল। এই রাজধানীটি ছিল বিশাল। জায়গাটি আন্ডিজ পর্বতমালার ১০, ৬০০ ফুট উঁচু একটি শিখরে। দেখা গেছে এটিই ছিল গোটা আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় শহর এবং উন্নত সংস্কৃতির পীঠস্থল।

এই ইন্‌কারা আর্কিটেক্‌চার বা স্থাপত্যবিদ্যায় যে দক্ষতা অর্জন

করেছিল তা এককথায় অভূতপূর্ব। ইউরোপের অধিকাংশ আদিম মানুষ যখন গুহা বা বনে-জঙ্গলে বসবাস করত তখন এই ইন্‌কারা যে সব অদ্ভুত সুন্দর দুর্গ নির্মাণ করেছিল তা উন্নত স্থাপত্যবিদ্যার এক চূড়ান্ত নিদর্শন। প্রায় ৩০০ টন ওজনের এক একটি পাথরের ব্লক পরস্পর জুড়ে দুর্গগুলির দেওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। কোন সিমেন্ট বা চুণ-সুরকি-বালির মিশ্রণ ছাড়াই ওই বিরাট পাথরের চাঁইগুলিকে এমনভাবে জোড়া হয়েছে যে ওই দেওয়ালে এমনকি একটি সরু ছুরির ডগাও প্রবেশ করানো কঠিন। ইন্‌কাদের যুগে লোহা বা ইস্পাত আবিস্কৃত হয়নি। তবুও অদ্ভুত দক্ষতায় পাথরের ছুরি দিয়ে ওই বিরাট পাথরগুলিকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে নিয়ে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে যেখানে যেমন দরকার তেমনভাবে জোড়া হয়েছে।

ইন্‌কাদের তৈরি সেতু, রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী, সেচের খালগুলি অসাধারণ উন্নত ছিল। কৃষিক্ষেত্রে তারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল বলে ধারণা করা হয়। তারা কতগুলি নতুন ধরনের শস্য উদ্ভাবন করেছিল। পাহাড়ে চাষের জন্য জল ও মাটি ধরে রাখতে ধাপ কেটে কেটে জমি তৈরি করার উপায়ও তারাই প্রথম উদ্ভাবন করে। শুধু তাই নয়, চাষের জমি উর্বর করতে তারা জমিতে সার দেওয়ার উপায়ও উদ্ভাবন করে। পক্ষী দ্বীপপুঞ্জ থেকে পাখীর বিষ্ঠা সংগ্রহ করে তা দিয়ে তারা প্রাকৃতিক সার তৈরি করে জমিতে ব্যবহার করত। ইন্‌কারা জীবজন্তুদের খুব ভালবাসত এবং বুঝতে পারত। তারা কুকুর সহ অনেক ধরনের জীবজন্তুকে গৃহে পালন করত। তারা পশু ও পাখি ধরার জন্য 'বোলাস' নামে এক ধরনের অস্ত্র তৈরি করেছিল। একটি শক্ত দড়ি দিয়ে দুধারে দুটো পাথরকে বেঁধে এই অস্ত্র তৈরি করতে হত, এটি এমনভাবে ছোঁড়া হত যে দড়িটি শিকারের পায়ে জড়িয়ে যেত এবং তারা সেটি টেনে নিয়ে আসত। এভাবে না মেরে তারা পশুপাখি ধরতে পারত।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ইন্‌কারা কোন লিখিত ভাষা উদ্ভাবন করতে পারেনি। সুতোর মধ্যে গিঁট বেঁধে বেঁধে মনের ভাব ও ভাষার আদান প্রদানে এক পদ্ধতি তারা চালু করেছিল। সেটিকে বলা হত 'কুইপাস'।

ইন্‌কারা 'গোয়ানাকো' নামে এক ধরনের ছোট উট পালন করত। এই উটের ব্রিডিং বা শঙ্কর প্রজনন করে তারা দু ধরনের পশুর জন্ম দেয়। এক শ্রেণী ভারবহনকারী জন্তু যার নাম ছিল 'লামা' আর এক শ্রেণীর পশু ছিল আজকের ভেড়াদের মত— যার লোম থেকে তারা উল তৈরি করত। এগুলোর নাম ছিল 'আলপাকা'। এই আলপাকার লোমের তৈরি উলের সুতোয় গিঁট বেঁধে বেঁধেই তারা বার্তা প্রেরণ করত। আলপাকা উলের বিভিন্ন রঙ করা হত। এবং এই বিভিন্ন রঙের উল দিয়ে তারা একজন বার্তা বহনকারীর মাধ্যমে সেনাদলের গতিবিধি, শস্য ও ফসলের অবস্থা বা বিভিন্ন স্থানের পরিস্থিতি সম্পর্কে স্থানান্তরে খবর পাঠাত।

কিন্তু এত উন্নত একটি সভ্যতাকে প্রায় পুরো ধ্বংস করে দেয় স্পেনের হানাদারেরা। স্পেনীয়দের ইন্‌কাদের এই অগ্রগতি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইন্‌কাদের স্পেনীয়দের মত বন্দুক বা উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। তাই তারা হেরে গেল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়রা শেষ 'ইন্‌কা' রাজাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে এতবড় এই সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে।

ইন্‌কারা প্রথমে 'কুজকো'তে ছিল। কিন্তু স্পেনীয়রা তাদের তাড়িয়ে দিলে তারা 'ভিলাকাপামা' নামে অন্য একটি পর্বত শিখরে গিয়ে আবার বসতিস্থাপন করে। যদিও স্পেনেরহানাদারেরা এখানে এসেও ইন্‌কাদের আক্রমণ করে এবং ইন্‌কারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তবুও স্পেনীয়রা ভিলাকাপামার দুর্ভেদ্য দুর্গনগরীর একেবারে অভ্যন্তরে সেভাবে প্রবেশ করতে ও ধ্বংস করতে পারেনি বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। কিন্তু এতদিন এই ধ্বংসস্তূপ অনেক

চেষ্টা করেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। হিরাম বিংহামের ধারণা তিনি যে বিশাল ধ্বংসস্তূপটি আবিষ্কার করেছেন সেটিই ভিলাকাপামা। সেখানে ছিল ইন্‌কাদের শেষ বসতি। প্রত্নতাত্ত্বিকরা অবশ্য নিশ্চিত নন যে এই 'মাচু পিচুই' 'ভিলাকাপামা' কিনা। ১৯৪০ সালে আবার একবার 'মাচুপিচু' এবং 'কুজকো'তে অভিযান চালানো হয়। এই দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থলে আরও পাঁচটি এই ধরনের দুর্গনগরী খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনটিই বিংহাম আবিষ্কৃত নগরীটির মত এত বিশাল ও প্রকাণ্ড নয়। এখানে বিংহাম একসঙ্গে ১৭৩টি কবর খুঁজে পান যা দেখে তাঁর মনে হয় এই 'মাচুপিচু' হয়ত ইন্‌কাদের তৈরি সেই বিখ্যাত 'ভারজিন অফ সান' মিশনারি যেটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল মিশনারি।

এই অনুমানের সত্যতা হয়ত কোনদিনই প্রমাণিত হবে না কারণ অন্যান্য সভ্য জাতির মত ইন্‌কারা কোন লিখিত ভাষা বা চিহ্ন ব্যবহার করেনি বা জানত না বলে কোন লিখিত তথ্যও নেই। তাই আমরা তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি তথ্য কোনদিনই জানতে পারব না। শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে বিংহামের এই আবিষ্কার প্রত্নতাত্ত্বিক জগতে এক বিরাট বড় অবদান হয়ে রইল।

কর্ণেল ওয়াটকিনসের অভিযান

ইউসুফ হুসেন ছিল মালয়ের এক পুলিশ ফাঁড়ির হাবিলদার। তার সঙ্গে আলাপ হবার দুদিন পরেই সে ঘটনাচক্রে প্রায় মারা পড়েছিল আমার হাতে। অবশ্য ঐ কাজের জন্যে আমাকে কেউ দোষ দিত কিনা সন্দেহ। কারণ আত্মরক্ষার জন্যে গুলি চালানো এমন কিছু অন্যায় কাজ নয়। কিন্তু সেদিন যদি তাকে আমি মেরে বসতাম, তবে এই গল্প বলার সুযোগ হতো না আর।

তবে সবটা খুলেই বলি। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি। তখন আমি, কর্ণেল ওয়াটকিনস, ছিলাম সিঙ্গাপুরে। হঠাৎ রাতারাতি মালয়ের চারিদিকে শুরু হয়ে গেল গৃহযুদ্ধ। গেরিলা আক্রমণের জন্যে পুলিশ অফিসারেরা কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। এই গোলমালটা বাধিয়েছিল মালয়ী সন্ত্রাসবাদীরা। তাদের ইচ্ছা ইংরেজকে তাড়িয়ে রবার বাগানগুলোর কর্তৃত্ব জোর করে দখল করে নেয়।

জঙ্গলের লড়াই-এ অবশ্য আমি হাত পাকিয়েছিলাম অনেক আগেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাকে কাটাতে হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। তাই চোরাগোপ্তা যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাঠানো হল জোহোরে। রেণগাম জেলার পুলিশ প্রধান হিসাবে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হল আমাকে।

এই কাজটা ছিল যেমন দুরূহ তেমনই বিপজ্জনক। মাত্র ১২০০ শ্বেতাঙ্গ ও মালয়ী রক্ষীর সাহায্যে আমাকে সামলাতে হয় সবকিছু। শান্তিরক্ষা করতে হবে ১৫০০ বর্গমাইল পরিমিত এক বিস্তৃত অঞ্চলের।

ঐ জায়গাটার অধিকাংশই ছিল জলাভূমি আর ঘন ঝোপ

জঙ্গলে ঢাকা। সেই অরণ্যের মধ্যেই ছিল সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানা। সুযোগ পেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত রবার বাগান, গ্রাম অথবা শহরের ওপর। প্রায় প্রতিদিনই তাদের হাতে মারা পড়ত দু-একটি নিরীহ মানুষ। এছাড়া লুঠতরাজ, ভীতি প্রদর্শন কিম্বা নিপীড়ন তো লেগেই ছিল সর্বক্ষণ। রাজনীতির অজুহাতে প্রায়ই ধরে নিয়ে যেত গ্রামের মানুষদের। তাদের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল মালয়ের অধিকাংশ অধিবাসী। এই গেরিলাদের সবচেয়ে বেশী রাগ ছিল রবার বাগানের মালিক আর কর্মচারীদের ওপরে। তাই রাত-বিরেতে তারা সুযোগ পেলেই হানা দিত সেখানে। নিঃশব্দে ঠিক বাঘের মত আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ত তারা। তারপর শুরু হয়ে যেত লুঠতরাজ আর নিপীড়ন। সবশেষে বাড়ী-ঘরে আগুন লাগিয়ে চুপিচুপি সরে পড়ত আবার। ফিরে যেত জঙ্গলের গুপ্ত ঘাঁটিতে। সেখানে লুঠের মাল ও অস্ত্রশস্ত্র জমা রেখে আবার ফিরে আসত গ্রামে। তখন আর তাদের দেখে চেনবার উপায় নেই। ভালমানুষটি সেজে তারা তখন বিলকুল মিশে গেছে আর পাঁচটি নিরীহ মালয়ীর সঙ্গে।

রেণগামে পোঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে। সেখানে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো হাজী, একজন পেট-মোটা মালয়ী সার্জেন্ট। দু'একটি মামুলী আলোচনার পর হাজী ডেকে পাঠালো জঙ্গল বাহিনীর সমস্ত কর্মীকে। এই কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে নাম কিনেছিল ইউসুফ হুসেন। এ-পর্যন্ত বহু সন্ত্রাসবাদীকেই নাকি খতম করেছে এই হাবিলদার। সিঙ্গাপুরে থাকার সময়ই আমি শুনেছিলাম এই লোকটির নাম। দুঃসাহসিক কার্যকলাপের জন্য সেটা ছড়িয়ে গিয়েছিল অনেক দূর। অবশ্য ইউসুফের বিখ্যাত হবার মূলে আর একটা কারণও ছিল। সেটা আমি জানতে পারি কয়েকদিন পরে। যে-কোন খাঁটি মুসলমানের কাছেই 'কাইন মীরহা' বা রক্তবস্ত্র পরম সৌভাগ্যের নিদান। ইউসুফ তার ধর্মপ্রাণতার জন্যে গুরুর কাছে

থেকে লাভ করেছিল এই পুরস্কার।

এই 'কাইন মীরহা' আসলে এক ধরনের মাদুলি। যার ভেতর ভরা আছে কিছু মন্ত্রপূত লাল কাপড়ের টুকরো। যে এটা একবার ধারণ করে তার নাকি ভাগ্য ফিরে যায়। বিশেষ করে বাঁ হাতে পরলে এই মন্ত্রপূত মাদুলি রক্ষা কবচের কাজ করে। তখন ছোরা বা বুলেটের আঘাত এড়ানো যায় খুব সহজেই। ইউসুফের হাতে বাঁধা ছিল সেই রক্ষাকবচ। আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না ঐ ধরনের কোন রক্তবস্ত্র ও মাদুলির ওপর। কিন্তু স্থানীয় লোকের বিশ্বাস 'কাইন মীরহা' আছে বলেই যমের দুয়ার থেকে বহুবার ফিরে আসতে পেরেছে হুসেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হাজী ডাক দিতেই আমার সামনে এসে দাঁড়ালো ইউসুফ। দোহারা গড়ন, ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল, মুখে লেগে আছে একটা হাসির আভাস। দেখে মনে হয়, আঠাশ-ঊনত্রিশ বছর বয়স। সুপুরুষই বলা চলে তাকে।

মালয়ীরা সাধারণতঃ কিছুটা আত্মসচেতন আর গম্ভীর প্রকৃতির। ইউসুফ তার মূর্তিমান ব্যতিক্রম। তার মুখে সর্বদাই কথার খই ফুটছে। তাকে দেখে মনে হল নিতান্তই এক ফাজিল ছোকরা।

প্রথম পরিচয়ে তাই মোটেই খুশী হতে পারিনি। বিশেষ করে দু-একটি কথা বলার পর আমার ধারণা হয়েছিল হয়তো একে নিয়েই গোলমাল বাধবে ভবিষ্যতে।

হাজী কাছে ডাকতেই সাধারণ সৌজন্য দেখাবার জন্যে মালয়ী ভাষায় আমি বলেছিলাম তাকে—জাদা বাইক? (খবর ভালো তো?)

দাঁত বার করে সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিয়েছিল হুসেন—না টুয়ান, বাইক চড়ে আসিনি আমি, এসেছি পায়ে হেঁটে।

এই ধরনের সস্তা রসিকতা করার কি উদ্দেশ্য সেটা প্রথমটায় বুঝতে পারিনি আমি। পরে একটু চিন্তা করতেই পরিষ্কার

হয়ে গেল ব্যাপারটা। নিজের ইংরাজী জ্ঞান জাহির করার জন্যেই ঐ কথা বলেছে ইউসুফ। তার বাচালতায় অবশ্য সে মুহূর্তে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম রীতিমত।

কিন্তু ইউসুফের গুণ বোঝা গেল দুদিন বাদে। সেদিন জঙ্গলবাহিনীর পাঁচজন কনস্টেবল, ইউসুফ আর আমি বেরিয়েছিলাম অঞ্চল পরিদর্শনে। জীপে করে ঘুরছিলাম বনের পথে। পনেরো মাইল দূরে রবার বাগানের ধারে আছে একটা পুলিশ ফাঁড়ি। সেই অঞ্চলটা রীতিমত দুর্গম আর বিপজ্জনক। সেখানে একটু ঘুরে আসবার মতলবেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা।

পাহাড়ি উঁচু-নীচু পথ। দুধারে গভীর অরণ্য। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর ঢালু হয়ে রাস্তাটা নেমে গেছে আরো গভীর জঙ্গলের মধ্যে। চলতে চলতে আমাদের জীপ গিয়ে পৌঁছালো সেই ঢালু আঁকা-বাঁকা পথের মুখে। মোড় ঘুরতেই ডানদিকের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে হঠাৎ ছুটে ছুটল এক ঝাঁক গুলি। এসে লাগলো জীপটার এঞ্জিনে। কোনক্রমে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সেই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচলাম আমরা। চোট-খাওয়া জীপের এঞ্জিনটা কিন্তু বিকল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তখন ঢালু পাকদণ্ডি পথে সোঁ সোঁ করে নেমে চলেছে আমাদের বাহন। ব্রেকটাও কাজ করছে না ঠিকমত। রীতিমত সঙ্গীন অবস্থা।

ঠিক সেই সময় অদ্ভুত কায়দায় স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে একটা খানার মধ্যে নামিয়ে দিল ইউসুফ। একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল বিকল বাহনটা। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম আমরা। ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম একটা ঝোপের আড়ালে।

কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল গুলির শব্দ। তখন সন্ত্রাসবাদীরা শিস দিয়ে সংকেত জানালো পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আর একদল সহচরকে। ঐ শিসের আওয়াজ দুধার থেকে ক্রমেই যেন এগিয়ে আসছে। সন্ত্রাসবাদীদের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক কিছু

জানতে না পারলেও তারা যে আমাদের চেয়ে সংখ্যায় ঢের বেশী এটা বুঝতে অসুবিধা হল না কারও।

এইভাবে কাটলো কয়েক মিনিট। দম বন্ধ করে যে-কোন ধরনের আক্রমণের আশঙ্কায় চুপ করে পড়ে রইলাম আমরা।

হঠাৎ একশো গজ দূরের একটা ঝোপ নড়েউঠলো সর-সর করে। তার আড়াল থেকে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মালয়ী ভাষায় চিৎকার করে উঠলো একজন—ওই! ওরাং মেলায় (ওহে মালয়ীরা), কোনরকম ঝামেলা না করে এখনি ফেলে দাও তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র। তোমাদের কোন ক্ষতি করবার ইচ্ছে নেই আমাদের। শুধু ওই অফিসারটিকে দিয়ে দাও আমাদের হাতে।

চরম অস্বস্তির মধ্যে কাটলো কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো—ওই! বাইক লা। (বেশ কথা) আমি ধরা দিচ্ছি, এইরইল আমার বন্দুক। আরে এ যে ইউসুফ হুসেনের কণ্ঠস্বর। সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে সে সামনের ফাঁকা জমিটার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল তার কারবাইন রাইফেলটা। প্রখর রৌদ্রে ঝলসে উঠলো তার ধাতব অংশ।

পরম সাহসী ইউসুফ হুসেন কিনা শেষপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল আমাদের সঙ্গে। হয়ত এখন বাকি পাঁচজন কনস্টেবলও অনুসরণ করবে তারই পথ। আমার তখন রীতিমত স-সে-মি-রা অবস্থা। কিন্তু তবু একেবারে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করা দরকার। তাই যে ঝোপের আড়াল থেকে ইউসুফ চেঁচিয়ে উঠেছিল, আমি সেইদিকেই তাক করলাম আমার রাইফেলটা। ট্রিগারের ওপর আলতোভাবে ছুঁইয়ে রাখলাম আমার আঙুল, যাতে প্রয়োজন হলেই লক্ষ্যবস্তুর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে গুলি করা যায়। এ অবস্থায় নড়াচড়া করাও বিপজ্জনক। তাহলে আমার অবস্থান কোথায় তা টের পেয়ে যাবে শত্রু পক্ষ।

কিছুক্ষণ বাদে সামনের ফাঁকা জমির ওপার থেকে শোনা গেল মানুষের নড়াচড়ার শব্দ। তারপর ঘন ঝোপের আড়াল থেকে হামা-

গুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল তিনজন সন্ত্রাসবাদী। তাদের নজর মাটির ওপর পড়ে-থাকা ইউসুফের রাইফেলের দিকে। তারা যখন প্রায় পৌঁছে গেছে বন্দুকটার কাছে, তখন আমার ডান পাশ থেকে আচমকা আবার চেঁচিয়ে উঠলো ইউসুফ হুসেন—ওই ইনি জুগা (তবে এটাও নিয়ে যা ঐ সঙ্গে)।

চমকে উঠলো সবাই। ততক্ষণে তিনজন সন্ত্রাসবাদীকে লক্ষ্য করে ইউসুফ ছুঁড়ে দিয়েছে একটা হাত-বোমা। প্রচণ্ড শব্দে ফাটলো সেই বোমাটা। আগুনের ঝলক, প্রচণ্ড আওয়াজ আর সন্ত্রাসবাদীদের আর্তনাদ—সব মিলিয়ে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম মুহূর্তের জন্যে। একরাশ কাদা আর পাথরের টুকরো ছিটকে পড়লো চারিদিকে। আর আমি প্রায় চাপা পড়ে গেলাম সেই রাবিসের নীচে। প্রবল অনুশোচনায় তখন দগ্ধ হচ্ছে আমার মন। ইউসুফ হোসেনকে ভুল বোঝার জন্যেই ওই অনুশোচনা। ইউসুফ কিন্তু বসে নেই। মাটিতে প্রায় বুক ঠেকিয়ে সে ততক্ষণে গিয়ে হাজির হয়েছে তার ফেলে দেওয়া রাইফেলের কাছে। সেটা টপ করে তুলে নিয়েই সে আবার ছুট লাগালো নিকটবর্তী একটা ঝোপের দিকে। সন্ত্রাসবাদীরা সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলো গুলি-বর্ষণ। সেই সময়েই ইউসুফের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে চেঁচিয়ে উঠতে হল আমাকে—ইউসুফ সিনি (ইউসুফ এই দিকে)।

বলামাত্র এক লাফে আমার পাশে এসে হাজির হল ইউসুফ। তারপর এক গাল হেসে বল্লে আমাকে—আপনাকে কিছুক্ষণের জন্যে খুবই কষ্ট দিয়েছি, সে অপরাধ মাফ করে দেবেন স্যার।

এই অবস্থায় মানুষকে আর কখনো হাসতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

ইউসুফকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে পেয়ে অনেকটা ভরসা পেলাম আমি। হয়তো এ-যাত্রা প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরা যাবে। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে শত্রুপক্ষের গতিবিধি ভালভাবে লক্ষ্য করা দরকার। তাই খানিকক্ষণ ঘাপটি মেরে চুপচাপ বসে থাকলাম

আমরা। চারদিক নিস্তব্ধ। একটা গাছের পাতাও নড়ছে না কোনখানে। এইভাবে কাটলো বেশ কয়েক মিনিট। অবশেষে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো ইউসুফ হুসেন, ফিস ফিস করে বললে আমার কানে কানে—ওরা ভয় পেয়ে পালিয়েছে স্যার। চলুন আমরাও সরে পড়ি।

ইউসুফের কথামত আমরা জঙ্গলের পথে যাত্রা করলাম সদর ঘাঁটির দিকে। পথ চলতে চলতে ইউসুফ এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। দুষ্টুমিভরা হাসিতে ঝিকমিক করছে তার চোখ। কিন্তু তাকে কোন রসিকতা করার সুযোগ না দিয়েই বল্লাম আমি তোমার দুষ্টবুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। প্রথমটা কিন্তু বেশ বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলে আমাকে। তবে শেষ পর্যন্ত তোমার চালাকিতেই যে প্রাণে বেঁচে গেছি সেটা ভুলবো না কোন-দিন।

অশেষ ধন্যবাদ স্যার—ইউসুফের মুখের দুষ্টু হাসিটা মিলিয়ে গেল সেই মুহূর্তে। সে ভক্তিভরে তাড়াতাড়ি একবার ছুঁয়ে নিল তার বাহুতে বাঁধা লাল কাপড়ের টুকরোটাকে।

সেইদিন আমি নতুন করে চিনলাম ইউসুফ হুসেনকে। তার বাইরের চেহারা দেখে তার সম্বন্ধে যে-ধারণা হয়েছিল সেটাও পাল্টে গেল বেশ কিছুটা। তার মত বিশ্বাসী উপস্থিত বুদ্ধি-সম্পন্ন ও সাহসী করপোরাল হয়তো একজনও ছিল না মালয়ের পুলিশ বহরে। নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসাবেও তাকে সমীহ করতো সবাই। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন নামাজ পড়তে কোনদিন ভুল হত না তার। এছাড়া ইউসুফের সঙ্গে সর্বদাই থাকত সেই রক্তবস্ত্র—তার রক্ষাকবচ।

সেই বছরেই গ্রীষ্মের মাঝামাঝি আবার চরম বিপদের মুখে পড়তে হল ইউসুফকে। বলা চলে তার রক্তবস্ত্রের শক্তি ভালভাবে পরখ করবার জন্যেই বিধাতা পুরুষ বুঝি তাকে ঠেলে দিলেন ঐ বিপদের মধ্যে।

সেদিনও জীপে চড়ে টহল দিতে বেরিয়েছিলাম আমরা। রেণগাম ছেড়ে আধ মাইলও গিয়েছি কিনা সন্দেহ হঠাৎ একটা মোড় ঘুরতেই দেখি রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে একটা গাছের গুঁড়ি। বেশ জোরেই যাচ্ছিলুম আমরা। তাই ঐ অবস্থায় হঠাৎ ব্রেক কষলে গাড়ি উল্টে যাবার সম্ভাবনা। আবার না থামালেও বিপদ। সোজা গিয়ে পড়তে হবে গুঁড়িটার ওপর। কিন্তু ভাববার জন্যে এক সেকেন্ড সময়ও পাওয়া গেল না তখন। ব্রেক চাপতে চাপতেই আমাদের জীপ ধাক্কা মারলো গুঁড়িটার গায়ে। ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুপাশে ছিটকে পড়লাম আমরা। ছিটকে পড়লাম পথের ওপর।

সন্ত্রাসবাদীরা ছিল এই সুযোগের অপেক্ষায়। নিকটবর্তী একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিল তারা। তাই গাড়ি থেকে ছিটকে পড়া মাত্র তারা শুরু করলো অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ।

কে কোথায় ছিটকে পড়েছে সেদিকে নজর দেবার মত সময় ছিল না তখন। পড়ি কি মরি করে আমি গিয়ে লুকালাম একটা খানার মধ্যে। সেখানে আগেই আশ্রয় নিয়েছিল আরো দুজন সেপাই। কিন্তু ইউসুফ কোথায়? পথের ধারে উল্টে পড়ে থাকা জীপটার দিকে চেয়ে দেখি তার পাশেই পড়ে আছে ইউসুফ হুসেনের অচেতন দেহ। তার মাথায় একটা গভীর ক্ষত। তার থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। হয়তো এখনও বেঁচে আছে ইউসুফ হুসেন। তাই যে করেই হোক রক্ষা করতে হবে তাকে। আমার সঙ্গী সেপাই দুজনকে সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য করে অনবরত গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়ে আমি বুকে হেঁটে এগিয়ে চললাম ইউসুফের দিকে। রীতিমত কসরত করেই টেনে আনতে হল ইউসুফের অচেতন দেহটা।

আমাদের কপাল ভাল যে ঠিক সেই মুহূর্তেই ঐ পথে এসে হাজির হল একটা মিলিটারী কনভয়। তাদের সাড়া পেয়ে নিঃশব্দে সরে পড়লো সন্ত্রাসবাদীরা। এতক্ষণ উত্তেজনায় কিছুই খেয়াল

ছিল না আমার। হঠাৎ নজর পড়লো নিজের জামাটার দিকে। দেখি রক্তে ভিজে গেছে তার হাতাটা। বাঁ কাঁধের অনেকখানি মাংস ছিঁড়ে নিয়ে একটা রাইফেলের বুলেট কখন যে ছুটে গেছে তা টের পাই নি সেই প্রবল উত্তেজনায়। বলা চলে এ যাত্রাতেও অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলাম আমরা। আমরা অর্থে, আমি আর ইউসুফ।

তবে আমাদের দুজনকেই হাসপাতালে থাকতে হল বেশ কিছুদিন। একদিন (যখন আমি প্রায় সেরে উঠেছি) বিকেলে ইউসুফ এসে হাজির হল আমার কেবিনে। তার মাথার ক্ষতটা তখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তার পরনে নীল-রুপালী ডোরা কাটা সারোঙ্গ (লুঙি) আর কমলা রংয়ের বাজু বা ফতুয়া। ইউসুফের মুখে সেদিন দুষ্টু হাসির বদলে একটা সলজ্জ ভাব। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর ঘরে ঢুকে পড়লো সে। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললাম তাকে। কিন্তু চেয়ারে না বসে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল ইউসুফ। তার মুখ দেখে মনে হল কোন একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে পারছে না যেন। অবশেষে সেই দ্বিধা কোনক্রমে কাটিয়ে উঠে মুখ খুললো ইউসুফ হুসেন।

—স্যার, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। তাই আপনাকে যে কি ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

—আরে থামো দেখি—সস্নেহে ধমক লাগালাম আমি—তোমার কপাল গুণেই রক্ষা পেয়ে গেছ এ যাত্রা।

—না স্যার, এটা ঠিক নয়, আপনিই বাঁচিয়েছেন আমাকে।

কথা বলতে বলতে বাজুর পকেট থেকে সুন্দর কারুকার্য করা একটা কাঠের ছড়ি বার করলো ইউসুফ। জিনিসটা প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। চমৎকারভাবে পালিশ করা।

—আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই ছোট্ট 'ক্রিশটা' (এক ধরনের গুপ্তি বা ঢেউ খেলানো ছোরা) যদি আপনি গ্রহণ করেন

তবে আমি খুবই খুশি হই!

তারপর আমার বিস্মিত চোখের সামনেই ইউসুফ কাঠের খাপের ভেতর থেকে টেনে বার করলো ঝকঝকে ছোট্ট 'ক্রিশ'টা। ঐ ছোরাটা এমনভাবে তৈরী যে খাপ থেকে বার করবার পর ঐ খাপটাকেই ব্যবহার করা যায় ছোরার বাঁট হিসাবে। ক্রিশ-এর মাথাটা স্ক্রু-এর মত পেঁচানো। সেটা সহজেই লাগিয়ে নেওয়া যায় খাপটার সঙ্গে।

—আজকাল খুব কম কারিগরই 'ক্রিশ' তৈরী করতে পারে। আমি অনেক অনুসন্ধানের পর এক বুড়োকে ধরে বানিয়ে নিয়েছি এটা। বিনীতভাবে জিনিসটা আমায় হাতে দিতে দিতে বললে ইউসুফ হুসেন। তাছাড়া—দ্বিধায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সে—তাছাড়া ফকির সাহেব মন্ত্র পড়ে পবিত্র করে দিয়েছেন ওটাকে। তাই ঐ ক্রিশটা সঙ্গে রাখলে মঙ্গল হবে আপনার। ওটা হাতছাড়া করবেন না কখনো।

এতক্ষণে ইউসুফের দ্বিধার কারণটা বুঝতে পারলাম আমি। ঐ মন্ত্রপূত ছোরাটা হাতছাড়া করতে চাইছে না তার মন অথচ বড় সাহেবকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ওটা উপহার না দিলেই নয়—ওটা দেবার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে ফেলেছে সে। তাই এই দোটানা ভাব।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে আমার হাতেই সে তুলে দিল সেই 'ক্রিশটা'। তারপর দু-একটা মামুলী কথার পর বিদায় সম্ভাষণ জানালো আমাকে—আদা বাইক।

পুরনো রসিকতাটার কথা মনে পড়ে গেল সেই মুহূর্তে। মৃদু হেসে তাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম—বাইকে চড়ে বেড়ানোর মত অবস্থা এখনো হয়নি আমার, তবে পায়ে হেঁটে বেড়াতে অসুবিধা নেই আর!

আমার রসিকতায় হেসে ফেলল ইউসুফ হুসেন।

হাসপাতাল থেকে ফিরে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটালো কয়েকটা দিন। কিন্তু আমার কপালে বোধহয় বেশিদিন সুখ ভোগ লেখেন নি বিধাতা।

তাই একদিন ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল টেলিফোনের শব্দে। পাশের ঘরে একটানা ঝন ঝন করে বেজে চলেছে যন্ত্রটা। ঘুম চোখে কোনরকমে জামাটা গায়ে গলিয়ে ছুটে গেলাম সেখানে। থানা থেকে ফোন করছে স্থানীয় অফিসার। সেমব্রং-এর রবার বাগান নাকি ঘিরে ফেলেছে সন্ত্রাসবাদীরা। ঐ দিক থেকে ভেসে আসছে গুলি ও হাত বোমার শব্দ। বাগানের টেলিফোন সংযোগও বিচ্ছিন্ন। তাই ওখানে ফোন করেও কোন সাড়া শব্দ মেলে নি। রীতিমত সংকটময় অবস্থা।

সেমব্রং রবার বাগিচার ম্যানেজার স্যাণ্ডি গ্রাণ্ট আমার বিশেষ বন্ধু। সে তার স্ত্রী ও দু বছরের বাচ্চামেয়ের ভাগ্যে যে কি ঘটেছে তা ভেবে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমি!

কোন রকমে গায়ে ইউনিফর্ম চড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলাম থানার দিকে। থানায় পেঁছে দেখি আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে সকলে। জীপ তৈরী। কয়েকজন সশস্ত্র সেপাইও এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত। ঐ দলের নেতা ইউসুফ হুসেন।

এক লাফে আমি তখনই উঠে বসলাম জীপটাতে। ইউসুফ বসলো ড্রাইভারের আসনে, বসেই ফিরে তাকালো আমার দিকে—স্যার ক্রিশটা সঙ্গে নিয়েছেন তো?

আমি গুলি রাখবার ব্যাগটার ওপর মৃদু চাপড় মেরে ঘাড় নাড়লাম সঙ্গে সঙ্গে—এই যে সব সময়েই ওটা থাকে আমার কাছে। রেণগাম থেকে সেমব্রং-এর দূরত্ব দু-মাইল। খোয়াই বিছানো উঁচু-নীচু পথ। দুধারে গভীর অরণ্য।

জীপটা রবার বাগিচার কাছাকাছি পেঁছাতেই আমাদের লক্ষ্য করে শুরু হল বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। বুঝতে পারছি এই ভাবে সরাসরি রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। যে কোন

মুহূর্তেই একটা গ্রেনেড মেরে ওরা উড়িয়ে দিতে পারে আমাদের। বরং গাছপালার আড়ালে গাড়িটাতে লুকিয়ে বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেই অক্ষত অবস্থায় আঘাত হানা যেত ওদের ওপর। কিন্তু ঐ প্ল্যানটা কার্যকর করতে হলে হাতে বেশ খানিকটা সময়ের দরকার। ততটা সময় ব্যয় করা এ যাত্রা অসম্ভব। কারণ তাহলে একজন অসহায় নারী ও একটি শিশুকে ঠেলে দেওয়া হবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

তাই ঝুঁকি নিতেই হবে। ইউসুফ প্রচণ্ড গতিতে গাড়িটা ছুটিয়ে নিয়ে চলল বাগিচার অফিস ঘরের দিকে। কাছাকাছি পেঁছিতেই অফিস ঘরের জানলা থেকে মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি ছুটে এসে অভ্যর্থনা জানালো আমাদের। দুটো চাকা এবং এঞ্জিনটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। আমরা সবাই উল্টে গিয়ে পড়লাম একটা নর্দমার মধ্যে। আঘাতের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে তাকালাম চারিদিকে। বাগিচার গুদোমগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা। রবার পোড়ার বিকট গন্ধে দম বন্ধ হবার জোগাড়। ঘন কালো ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। কে জানে কি অবস্থায় আছে গ্রান্টস-এর পরিবার। তার বাংলোটা এখান থেকে দু'শো গজও হবে না। তবু পেঁছিতে হলে পার হয়ে যেতে হবে ঐ অফিস বাড়িটা। এখন উপায়?

—যেমন করেই হোক খতম করতে হবে ঐ লোকগুলোকে—অফিসঘরের জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি ফিস ফিস করে বললাম ইউসুফকে। আমার কথা শেষ হবার আগেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো ইউসুফ হুসেন। তার হাতে ধরে থাকা গ্রেনেডটা ঝলসে উঠলো ভোরের হাল্কা রোদ্দুরে। তারপর দৌড়ে গিয়ে হাজির হল অফিস বাড়ির দোরগোড়ায়। এক লহমার মধ্যেই যেন ঘটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে ততক্ষণে ছুঁড়ে দিয়েছে গ্রেনেডটা। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলো না করপোরাল। ফেরার মুখে একটা বুলেট এসে বিঁধলো তার বুকে

দোরগড়াতেই মুখ থুবড়ে পড়লো সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল হাত বোমাটা। অফিসঘরের কাঠের দরজাটা ধ্বসে পড়লো হুড়মুড় করে। ইউসুফের ভাই আবদুল। সেও কম যায় না। সে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলো দাদার কাছে। কোমরবন্ধে ঝোলানো আর একটা গ্রেনেড সেও ছুঁড়ে দিল ঘরটার দিকে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে এল দাদার অচেতন দেহটা।

অফিস ঘরটার তখন শোচনীয় অবস্থা। তার ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল জনাকয়েক সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু আবদুলের শ্যেন চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারলো না তারা। গর্জে উঠলো কারবাইন রাইফেল। মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো ইউসুফ হুসেনের দুশমনেরা। কিন্তু বিপদ কখনও একা আসে না। আসে না একদিক থেকেও। তাই হঠাৎ আমার পিছন থেকে গর্জে উঠলো কয়েকটা রাইফেল। সন্ত্রাসবাদীরা অতর্কিতে হানলো মোক্ষম আঘাত। আমার পাশেই ছিল আবদুল। বুলেটের আঘাতে সে ছিটকে পড়লো নালার মধ্যে। আর একজন সেপাই ছিল আমার ডানদিকে। সেও রক্ষা পেল না ঐ আক্রমণের হাত থেকে।

প্রায় মরিয়া হয়েই তখন ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। হাতে ধরা সাব-মেশিনগানটার ট্রিগার চেপে ধরলাম সেই মুহূর্তে।

ঝক্-ঝক্-ঝক্—এক ঝাঁক গুলি ছুটে গেল আততায়ীদের সন্ধানে। একটা ল্যানটেনা ঝোপের আড়ালেই গুঁড়ি মেরে বসে ছিল তারা। কোনরকম শব্দ না করেই মুখ থুবড়ে পড়লো মাটির ওপর।

এরপর ফিরে এলো শ্মশানের শান্তি। তবু প্রতি আক্রমণের ভয়ে নালার মধ্যেই শুয়ে কাটাতে হল কিছুক্ষণ। তারপর সন্ত্রাসবাদীদের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমরা তিনজন। তার মধ্যে দুজনের অবস্থা তখন শোচনীয়। কয়েক পা এগিয়েই টলে পড়লো তারা।

কিন্তু ভাববার সময় নেই আর—তাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে তখনি ছুটে গেলাম গ্রাণ্টসের বাংলোয়। গ্রাণ্টস তার স্ত্রী এবং কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে ছিল বাথরুমের মধ্যে। কয়েকটা টেবিল চেয়ার জড়ো করে দরজার কাছে বেশ একটা চলনসই ব্যারিকেডও তৈরী করে নিয়েছিল তারা। পাছে মেয়েটি কান্নাকাটি শুরু করে তাই বাথটবের মধ্যে জল ভরে তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই বাচ্ছাটিকে। এত ডামাডোলের মধ্যেও সে দিব্যি খেলা করে যাচ্ছে সেখানে। সবাইকে অক্ষত দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম সে যাত্রা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রেণগাম থেকে এসে পড়লা দুগাড়ি বোঝাই সিপাই সান্ত্রী। তাদের সাহায্যে ঘিরে ফেলা হল রবার বাগিচাটা। কিন্তু ততক্ষণে সরে পড়েছে সন্ত্রাসবাদীরা। এইবার আমাদের ক্ষয়ক্ষতি বিচারের পালা। দেখা গেল করপোরাল ইউসুফ হুসেনের এমারজেন্সী স্কোয়াডের আটজনের মধ্যে মাত্র জীবিত আছে এক-জন। সবচেয়ে আক্ষেপের কথা, বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছেন স্বয়ং করপোরাল। তার ভাই আবদুলও ঢলে পড়েছে দাদারই পাশে। আমি কোন অলৌকিক উপায়ে যে বেঁচে গেছি সেটা আমার নিজের কাছেই মনে হল এক গভীর রহস্য। ক্লান্ত দেহটাকে কোনরকমে টানতে টানতে শেষবারের মত একবার গিয়ে দাঁড়ালাম ইউসুফের পাশে। শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানালাম আমরা বিদায়ী বন্ধুকে...

রেণগামে গিয়ে পেঁাছানো মাত্র সার্জেণ্ট মেজর হাজী এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে খণ্ড-যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম তাঁকে। বিবরণ দিতে দিতে গলাটা ভারী হয়ে এল নিজেরই অজান্তে—বড়ই বিস্ময়ের কথা এ যাত্রা কাইন মীরহা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল ইউসুফ হুসেনকে!

—আমরা কিন্তু আদৌ অবাক হইনি—বিষণ্ণ, গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন সার্জেণ্ট মেজর—বরং রক্ত বস্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতা

প্রমাণিত হয়েছে এবারেও।

—তার মানে ?

—স্যার, আপনাকে ইউসুফ যে ক্রিশটা দিয়েছে সেটা কি আপনি কখনও খুলে দেখেন নি ? রক্তবস্ত্র খণ্ডটি তো জড়ানো আছে ওর হ্যাণ্ডেলেই।

—সে কি !—এইবার আমার হতবাক হবার পালা। সঙ্গে সঙ্গে পকেটের ভিতর থেকে টেনে বার করলাম ছোট ক্রিশটা। টান দিতেই খুলে এল তার হাতলটা। দেখি সত্যিই তার ভিতর লুকানো রয়েছে এক টুকরো লাল কাপড়। ইউসুফ হুসেনের কাইন মীরহা। ইউসুফ হুসেনের রক্ষা কবচ !

প্রাথমিক বিস্ময়ের ভাব কাটবার পর অশ্রুসজল হয়ে উঠলো আমার চোখ দুটো। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম ইউসুফের উপহারের প্রকৃত গুরুত্ব। নিজের জীবন দিয়ে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমার জীবন। এর থেকে বড়ো উপহার আর কি হতে পারে ?

বরফের টুপি পরা দ্বীপে

সুমেরুর কাছাকাছি আর্কটিক মহাসাগরে পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ গ্রীনল্যান্ড। এর গোটা এলাকার প্রায় ৮৪ শতাংশ ঢাকা বরফে, যুগ যুগ ধরে জমতে জমতে যা এক পাহাড়ের রূপ নিয়ে আছে এবং যার নাম দেওয়া হয়েছে "দ্য আইস-ক্যাপ"। পায়ে হেঁটে এটি অতিক্রমের চেষ্টায় অনেকে ব্যর্থ হবার পর প্রথম যিনি সফল হন সেই ফ্রিটিওফ নানসেন (Fridtjof Nasen) সুমেরু অঞ্চলে আরও অনেক দুঃসাহসিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে অমর হয়ে আছেন। উল্লেখযোগ্য, ১৮৮৮ সালে আইস-ক্যাপ অতিক্রম তাঁর জীবনের প্রথম ভাগের কীর্তিসমূহের অন্যতম। তখন তাঁর বয়স মোটেই ২৭ বছর।

গ্রীনল্যান্ড-এর পূর্ব উপকূল থেকে যাত্রা শুরু। শেষ হবার কথা আইস-ক্যাপ পেরিয়ে পশ্চিম উপকূলে। যদি না সেখানে পৌঁছবার আগেই ওই ঠান্ডায় ওখানে মরে পড়ে থাকতে হয়। আশংকাটি অমূলকও হয়ত ছিলনা। তুষার-মরু আইস-ক্যাপ প্রাণধারণের অনুকূল পরিবেশ কখনই নয়। নরওয়ের নাগরিক নানসেন-এর আগে যাঁরা একই উদ্দেশ্যে এখানে আসেন তাঁদের সবাইকে মাঝ পথ থেকে ফিরে যেতে হয়। অথচ তাঁদের কারও সাহসের অভাব ছিল না। এদের মধ্যে দুজনের নাম করা যেতে পারে—এডওয়ার্ড হুইম্পার ও রবার্ট ব্রাউন। কয়েকটি ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে, অভিযাত্রীরা তাঁদের গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গিয়েও পিছু হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন।

এর অন্য কারণও হয়ত ছিল, যার কথা নানসেনের মনে হয়েছিল। তাঁর আগে যাঁরা এপথে নেমেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন অভিজ্ঞ, সঙ্গে সাজ সরঞ্জামের অভাব ছিল না। নানসেন-এর দৃঢ়

বিশ্বাস ছিল তাঁদের ব্যর্থতার মূল কারণ তাঁরা পশ্চিম থেকে যাত্রা শুরু করে আইস-ক্যাপ পেরিয়ে পূবের উপকূলে এসে সেখান থেকে যে যার দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন। তখন গ্রীনল্যান্ড-এর পশ্চিম উপকূলেই জনবসতি বলতে যা কিছু ছিল। পূবে ছিল শুধুই জনহীন পতিত জমি, যেখান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফুরিয়ে যাবার পর পুনরায় সংগ্রহ করার কোন উপায়ই ছিল না। নানসেন ঠিক করলেন, পূব থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম উপকুলে শেষ করবেন। সেটাই ঠিক হবে। কারণ পূবে কিছু পাওয়া না গেলেও কোন ক্ষতি নেই, যেহেতু যাত্রার শুরুতে সঙ্গে থাকবে প্রচুর জিনিষপত্র। সে সব ফুরোতে ফুরোতে তাঁরা পশ্চিমে এসে পড়বেন যেখান থেকে সব নতুন করে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা যাবে। পূব থেকে পশ্চিমে মানেই হবে "নেই-নেই"-এর রাজ্য থেকে "আছে-আছে"-র রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। যত আশা সব সামনে। অভিযানে উৎসাহ যোগাবে এই আশা, যত এগিয়ে আসবে পশ্চিম উপকূলের জনবসতি। ওখানেই গ্রীনল্যান্ড এর রাজধানী গোটহাব।

সব দিক চিন্তা করে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন নানসেন। হাতে টানা স্লেজগাড়ী তৈরি করালেন পাঁচটি, প্রতিটি অভিযানের প্রয়োজন অনুযায়ী মাপ ও আকার দেওয়া। প্রতিটির ওজন ২৮ পাউন্ড। বরফের উপর দিয়ে চলবার জন্য স্লেজ-এ চাকার বদলে থাকে রাণার, সেগুলি ইস্পাতে বাঁধানো। বরফের উপরে হাঁটার জন্য রাখলেন তুষার পাদুকা (Snowshoe) ও শী (Ski)।

অভিযানে সঙ্গী হলেন যাঁরা তাঁদের প্রত্যেকের যোগ্যতা, পরীক্ষিত। এঁদের তিনজন নরওয়েজিয়ান—অটো সোয়েরড্রুপ, ক্রিষ্টিয়ান ট্রানা ও ওলাফ ডিয়েট্রিকশন। দুজন ভারবাহী ল্যাপ-ল্যান্ডার—রাওনা ও বাল্টো।

যাত্রা শুরু হল ১৫ আগস্ট। প্রথম পর্যায়ে দু-তিন মাইল হেঁটে অভিযাত্রীরা পেঁছলেন একটি জায়গায়। সেখানকার উচ্চতা

৫00ফুট। ওখানেই পড়ল তাদের প্রথম তাঁবু। রাতটি কাটিয়ে পর-দিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে আবার এগোতে এগোতে এমন এক জায়গায় পেঁছিলেন যেখানে সামনে পড়ল এক দীর্ঘ ফাটল বরফের উপর। সেটি পার হওয়া এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ভারী মালপত্রে বোঝাই স্লেজগাড়ি টানতে টানতে পার হতে হবে। পা পিছলে ফাটলে পড়ে গেলেই সব শেষ। এই বিপদ থেকে বাঁচতে প্রত্যেকে দড়ি দিয়ে নিজ নিজ দেহ স্লেজের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। খুঁজে খুঁজে এদিকে ওদিকে দু'একটি তুষার-সেতু বার করে তাঁরা ফাটলগুলি কোনরকমে পার হলেন। এক চুলের জন্য কেউ কেউ বেঁচে গিয়ে-ছিলেন, এমনই বিপদসংকুল সেই সব ফাটল। একজন তো পড়ে গিয়ে বগল অবধি তলিয়ে গিয়েছিলেন, কোন মতে তাঁকে টেনে তোলা হয়।

দুদিন এইরকম চরম বিপদের মধ্যে দিয়ে এগোন হল। তার পর এল ঝড়। বার বার করে। এক পা এগোনও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। থেমে গেল অগ্রগতি। বসে বসেই সময় কেটে যেতে থাকে। সঙ্গে রয়েছে সীমিত খাদ্যদ্রব্য। বসে খেয়ে ফুরিয়ে দিলে তারপর? ফিরে যেতে হবে অভিযান মাথায় তুলে দিয়ে। নানসেন কমিয়ে দিলেন র‍্যাশনের পরিমাণ। নামে মাত্র খাওয়া। খাবার বাঁচিয়ে রাখতে হবে সামনে যতটা পথ রয়েছে তার জন্য।

আগস্ট-এর ২৩ তারিখের মধ্যে অভিযানটির দ্বিতীয় পর্যায়ে ন' মাইল অতিক্রম করা সম্ভব হল। এর মধ্যে মনোবলও খানিকটা ফিরে এসেছে। মোটামুটি খোশমেজাজেই আছেন সবাই। এমন সময় হঠাৎ তাঁরা এসে পড়লেন এক জায়গায় যেখানে তুষারে পা ডুবে যেতে থাকে।

হাঁটা হয়ে পড়ে প্রায় অসম্ভব। এগোতে হয় শামুকের গতিতে। দলের মনোবল বাড়াতে নানসেন সবার জন্য বরাদ্দ করলেন প্রতি মাইলে একটি করে পুষ্টিতে ভরা মাংসের চকোলেট।

এমনি করেই সেই 'অজানা ভূখণ্ডের সন্ধানে তাঁরা এগিয়ে

চললেন। চলতে চলতেই রাতের খাবারটা রান্না করে নেবার একটা উপায় নানসেনের মাথায় এল। একটি চলন্ত স্লেজে স্টোভ জ্বালানো হল। তাতে রান্না তুলে দেওয়া হল। সবারই মন খুশী, এই শীতে একটু গরম খাবার খাওয়া যাবে। খাওয়া যাবে তাঁবু খাটাবার সঙ্গে সঙ্গেই কারণ ততক্ষণে রান্নাটা পথেই হয়ে যাবে।

সবই ঠিক ছিল, কিন্তু মাটি হয়ে গেল একটি দুর্ঘটনায়। স্লেজ থেকে রান্না খাবারটি তাঁবুতে স্থানান্তরিত করতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেলেন নানসেন। তবু ভাগ্যি স্টু-এর পাত্রটি যেখানে পড়ল সেখানে পাতা ছিল একটি ওয়াটারপ্রুফ তেরপল। তার চার কোনা তুলে ধরে সেই অবস্থায় বয়ে নিয়ে এসে আবার পাত্রে ঢেলে দেওয়া হল সবটা স্টু। খাবার সময় দেখা গেল ওই তেরপলে কত কি আবর্জনা পড়ে ছিল তা সব মিশে গেছে স্টু-এর সঙ্গে। সেই সব সমেতই তা খেতে হল সবাইকে।

খেতে খেতে দু'চারটে অপ্রিয় মন্তব্যও কেউ কেউ করলেন। এর মধ্যে একজন সেই ল্যাপল্যাণ্ডার বাল্টো। দলের মধ্যে এই বাল্টোর মুখেই শোনা যেত নানা রকম শ্লেষোক্তি যা দিয়ে সে অসন্তোষ প্রকাশ করত। কাজে অবশ্য ছিলনা তার অনীহা। কোন পরিশ্রমই তার কাছে ছিলনা পরিশ্রম। ক্লান্তি বলে কোন জিনিস তার অজানা ছিল। নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যেরও ছিলনা অভাব কিন্তু মত প্রকাশে তার ছিল না কোন দ্বিধা। যা মনে আসত সঙ্গে সঙ্গে খোলাখুলি তা বলে দিত।

নানসেন লক্ষ্য করেছিলেন, বাল্টো মাঝে মাঝেই এটা ওটার কথা বলত যা অপ্রয়োজনীয়, ফেলে দিলে বোঝা কমে যায়। বোঝা হালকা করতে চাওয়ার যুক্তিও যথেষ্ট ছিল। সব কিছুরই সমালোচনা বাল্টোর স্বভাবেই ছিল। যেমন, সে বলত বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে স্নো-শু (snowshoe) প্রয়োজন হয় না। ঠিকই বলত। কিন্তু তুষারের ঝাপটা থেকে চোখ রক্ষা করতে snow-goggles-এর দরকার নেই এটা যে ভুল তা তাকেও এক সময় স্বীকার

করতে হয়েছিল।

ছ' হাজার ফুট উপরে একটা সমতল এলাকায় এসে নানসেন বললেন, স্লেজগুলিতে নৌকার মত পাল খাটিয়ে দাও, বেশ হাওয়া বইছে, এটাকে কাজে লাগানো যাক স্লেজ টানার পরিশ্রম কমাতে। শুনে বাল্টো হেসেই খুন। পাগল না কি? ডাঙ্গায় পাল তোলা? কে শুনেছে কবে?

এই অবস্থায় এসেই নানসেনের মনে সন্দেহ দেখা দিল। ঠিক সময়ে পশ্চিম উপকূলে পেঁছানো যাবে তো? ঋতুর শেষ জাহাজটি স্বদেশের মুখে ফিরে যাবার আগে? তা না হলে তো দীর্ঘকালের জন্যে উপকূলে আটকা পড়ে থাকতে হবে অন্ধকারে ঢাকা গোটা শীতটা জুড়ে। আইস-ক্যাপ অতিক্রমের স্বপ্ন এতদিনে যেন আর নেই।

এর পর আরও পরীক্ষায় পড়তে হল। রাতের পর রাত ভয়ে কাটতে থাকে, প্রবল ঝড়ে তাঁবুগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে হয়ত। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় তুষার কণায় সম্পূর্ণ ঢাকা চোখ নিয়ে। সারারাতের ঝড়ে স্লেজগুলি তুষারে ঢাকা পড়ে যায়, প্রতিদিন সকালে তা খুঁড়ে বার করতে হয়। বার করবার পর সেগুলিকে চালু করতে নানা কসরত করতে হয়।

সাড়ে ছ'হাজার ফুট উঠে পড়তে হল সূর্যের আলোর প্রকোপে। চোখ মেলে তাকিয়ে থাকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ওই অসম্ভব সহিষ্ণু দুই ল্যাপ অনেক দিন তা সহ্য করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখে গগ্‌লস পড়তে বাধ্য হল।

ট্রানার পা ভেঙ্গে গেল, তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে শেষ পর্যন্ত ১ সেপ্টেম্বর-এ ৭৯৩০ ফুট উঁচুতে পেঁছলেন। সেই অসীম অপার তুষার সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখে শুধু একটি বোধ —শ্বেতত্ববোধ। সাদা, সাদা—শুধুই সাদা। সেখানে না আছে কোন দিগন্তরেখা না আছে এমন একটি কিছু যার ওপর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পারে।

স্লেজগুলিকে যাতে ওই নরম তুষারের ওপর দিয়ে কোনমতে টেনে নেওয়া যায় সেজন্য নানা চেষ্টা করলেন নানসেন, কিন্তু কিছুই হলনা।

এর এগার দিন পর নানসেন তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন, "আজ সোয়েরড্রুপ ও আমি দেখছি স্লেজ টানা অসম্ভব।" শেষ পর্যন্ত তাঁরা চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। স্লেজ-এ জিনিসপত্র যাছিল সব বাল্টোর স্লেজে চাপিয়ে দিলেন। বাল্টো গাঁই গুঁই শুরু করে দিল। বলল "আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, এ কাজ নেবার আগে বলেছিলাম আমরা এক একজন দেড় মনের মত বোঝা টানতে পারব। এখন তো দেখছি তিন মনের ও বেশি টানতে হচ্ছে। আমরা কি ঘোড়া?"

এবারে শী-গুলি বার করা হল। পরের উনিশ দিন এগুলি ব্যবহার করে ২৪০ মাইল অতিক্রম করলেন অভিযাত্রী দল। পরে নানসেন লিখেছিলেন, শী না থাকলে এই অভিযান ব্যর্থ হ'ত।

অভিযান সফল হয়েছিল বটে কিন্তু চুড়ান্ত দুর্যোগের পর। কতবার এল তুষার ঝড়, আর কি ভয়ংকর রূপ নিয়ে। চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দেয় যেন জমে যাওয়া শিশির বিন্দু। সূর্য ঢাকা পড়ে। তাকে ঘিরে দেখা যায় আবছা মন্ডল। আবার সূর্য অস্ত যাবার পর মনে হয় যেন অনেকগুলি সূর্য আকাশের দিগন্তে।

যত তাঁরা দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করতে থাকেন, শীত তত বাড়তে থাকে, দুপুর রোদের উষ্ণতা সত্বেও। রাতে সারা মুখে, চুলে দাড়িতে বরফ জমে যায়। আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট ফাঁক না করলে কথা বলা যায় না। এক ভয়ংকর ঝড়ের রাতে বাল্টো সাহস করে বেরিয়ে এসেছিল চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে। কিন্তু ঝড়ের এক ঝাপটা তাকে ছুঁড়ে দিল তাঁবুর ভিতরে। পরদিন ঝড় কমল, কিন্তু ততক্ষণে বরফে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেছে। বরফ খুঁড়ে বেরিয়ে আসতে হয়।

এত কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে কি খেয়ে? এক ঘেয়ে বিস্কুট, সামান্য মাংস, মেটে, বীন সুপ। সপ্তাহে একদিন মাখন। জলের

কষ্টও আছে। সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখে তাঁরা পেঁছিলেন ৮২৫০ ফুট উচ্চতায়। হিসাবে দেখা যায় সেখান থেকে পশ্চিম উপকূল ৭৫ মাইলের মত হবে। বাল্টো এক সময় বলে সে নাকি মাটি দেখতে পেয়েছে। তুষার মুক্ত। আসলে ওটা চোখের ভুল। বাল্টো চুপ করে যায়। রাওনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "সাগর পারে যাওয়া আর হলো না।"

নানসেনকে একদিন কাগজ পেনসিল হাতে দেখে বাল্টো বলে, এখান থেকে সাগর পার কতদূর তা কি অঙ্ক কষে বার করা যাবে ? কেউই তো আজ পর্যন্ত এ পথে পা দেয় নি। কথাটা নানসেন এড়িয়ে যান।

সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ এসে গেল। এর মধ্যে আইস-ক্যাপ পেরিয়ে আসা হয়েছে। এখন অবতরণ। শীতটা এই উচ্চতায় কম, উত্তাপ শূন্য ডিগ্রীতে নামছে না। একটু যেন সহ্যের মধ্যে এর আগের কদিনের তুলনায়। দিনটি ছিল মাখন খাবার। হঠাৎ একটা পাখিও চোখে পড়ল। উড়ে যাচ্ছে। সবারই মনে যেন বল ফিরে এল।

অবস্থার উন্নতি এরপর থেকে হতে থাকল। স্লেজগুলি আবার পাল তুলে দিল। চলতে চলতে হঠাৎ একদিন বাল্টোর গলা শোনা গেল, "ওই যে মাটি।" এবারে সে ভুল দেখেনি। সবাই একসঙ্গে তাকালো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দূর পশ্চিমে নীচু এক পাহাড়, যা বরফে ঢাকা নয়। আনন্দ, আনন্দ ! সবার মুখে হাসি।

সেদিন সবারই উৎসবের মেজাজ। দুপুরে একটির জায়গায় দুটি করে মাংসের চকোলেট। বিস্কুটের সঙ্গে জ্যাম ও মাখন বরাদ্দ হল। খাবার পর আবার যাত্রা শুরু। আনন্দের আতিশয্যে গতি হল দ্রুততর। এক গভীর খাদের কাছে এসে পড়তে পড়তে সবাই বেঁচে গেলেন। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে নানসেন ঠিক করলেন ভাল করে না দেখে শুনে আর এগোবেন না। ঠাণ্ডা কম হলেও হাতের ও পায়ের আঙ্গুল তখনও সবার জমে যাচ্ছিল।

পরদিন সকালে আরও ভাল করে দৃষ্টি পথে এল গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে গোট হাব ফিওর্ড এর আশপাশের গোটা এলাকা। ব্রেকফাস্ট হল ওটমীল বিস্কুট-এর সঙ্গে চীজ ও যত কাপ মন চায় চা দিয়ে। এখান থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত অসংখ্য ফাটল। অনেক বারই পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন সকলে। দিন দশ পরে সব চাইতে বিপজ্জনক ফাটলটির ধারে এসে পড়লেন অভিযাত্রীরা। সেটি পার হবার চেষ্টা না করে ফিরে গিয়ে অনেক ঘুরপথে ফাটলটি এড়ানো সম্ভব হল।

পরদিন আর একটা দুর্ঘটনা থেকে এক চুলের জন্য বেঁচে গেলেন নানসেন। এক তুষার সেতু পার হতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন ফাটলে, ভাগ্যক্রমে বেরিয়েও আসতে পেরেছিলেন।

নানসেনের ডায়েরি থেকে জানা যায়, কতবার তাঁদের স্লেজগুলি কাঁধে নিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়েছে, বরফের দেয়াল পার হতে হয়েছে। কিন্তু কিছুই তাদের গতি রুদ্ধ করতে পারেনি—এগিয়ে চলেছেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে, পশ্চিম উপকূলে পেঁছিবার আগে থামা চলবে না।

অবশেষে একদিন সকলে পেলেন পায়ের নীচে মাটির স্পর্শ। সেখানেই তাঁরা থামলেন। ঘাসে ও লতা গুল্মে ঢাকা মাটিতে জায়গা করে নিয়ে আগুন জ্বালালেন। সেই মাটির উপর বিছানা পেতে সেখানেই রাত কাটালেন। পরদিন একান্ত প্রয়োজনীয় মালপত্র রেখে বাকী সব ফেলে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক নদীর ধারে এসে পড়লেন। দু পারে উইলো, অ্যালতার গাছের সারি। কোনো রকমে একটা নৌকার মত কাঠামো তৈরি করে তাকে ওয়াটারপ্রুফ চাদরে বসিয়ে একটা ডিঙ্গির মত বস্তু পাওয়া গেল। ওই রকম করে দাঁড়ও একটি তৈরি হল কাঠের "Y" আকারের ফ্রেম ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে ঢেকে। দুজনের উপযুক্ত নৌকাটিতে চাপলেন নানসেন ও সোয়েরড্রুপ। নদী বেয়ে এগোতে এগোতে এক প্রশস্ত ফিওর্ড-এ এসে গেলেন। সারাটা পথ নৌকার জল ছাঁকতে ছাঁকতে

আসতে হয়েছিল। ফিওর্ড থেকে সমুদ্রে পড়ে উপকূল বেয়ে এগোতেএগোতে অবশেষে পাঁচ দিনের মুখে গোট হাব-এ পেঁছি-লেন। তখন গোট হাব বলতে কেবল কয়েক সারি কুঁড়েঘর। যার অনেকগুলি এস্কিমোদের।

ডিঙ্গি থেকে নেমে এবার তাঁরা দলের আর সবাইকে সেখানে আনার ব্যবস্থায় মন দিলেন। তাঁদের দেখে স্থানীয় অনেকে গান গেয়ে স্বাগত জানালেন। দুর্ভাগ্যবশত, সেই ঋতুর শেষ জাহাজটি তার আগেই স্বদেশের পথে পাড়ি দিয়েছে, ফলে ওইখানে তাঁদের থেকে যেতে হল দীর্ঘ শীতের কয়েকটি মাস, এরপর গ্রীষ্মের শুরুতে প্রথম যে জাহাজটি আসবে তার অপেক্ষায়। ওই শীতে, আর্কটিক অঞ্চলের অন্তহীন রাতের অন্ধকারে। তবে এই কষ্ট যে কষ্ট সয়ে তাঁরা অভিযানটি সফল করলেন, তার তুলনায় নগণ্য—এইটুকুই সান্ত্বনা।

ইংরেজ বেদুইন লরেন্সের অভিযান

তাঁর দেশবাসী ছাড়াও অন্যত্র সকলেরই কাছে তিনি লরেন্স অব অ্যারাবিয়া। যদিও আসল নাম তাঁর টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আরবদের পাশে দাঁড়াতে যে ক'জন ব্রিটিশ সামরিক অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। তাঁর বয়স তখন ২৯ বছর। বেঁটে খাটো রোদে পোড়া বেদুইন বেশধারী এই ইংরেজের বিস্ময়কর সাহস ও বুদ্ধির অনেক প্রমাণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে পেয়ে আরবরা তাঁকে মাথায় তুলে নিয়েছিল। তারই একটি নিয়ে এই কাহিনী।

সময়টা ১৯১৭-র সেপ্টেম্বর। তারিখ ১৮। স্থান হেজাজ রেলওয়ের ধার। উটের পিঠে চাপা আশি সৈন্যের এক আরব বাহিনী এগিয়ে চলেছে রেল পথের ধার দিয়ে। পুরোভাগে মেজর লরেন্স। জায়গাটি পাহাড়ের গায়ে। একটি উপত্যকার পাশ দিয়ে রেলপথটি চলে গেছে। লরেন্স ও তাঁর বাহিনী এক বালির ঢিবির কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঢিবির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকবার একটা জায়গা বেছে নিলেন। একটু দূরে আর একটি নীচু উপত্যকা। রেলপথটি এই উপত্যকার এপার থেকে ওপারে চলে গেছে একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে। লরেন্স ও আরব বাহিনী যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে ব্রিজটি দেখা যায়। তুর্কী সৈন্যে বোঝাই একটি ট্রেন আসবার সময় হয়েছে। লরেন্স-এর মাথায় রয়েছে এক ঢিলে দুই পাখি মারবার এক প্ল্যান—শুধু একটি বিস্ফোরণে এই ট্রেন আর ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে। এর জন্য বিস্ফোরকটি রাখতে হবে ব্রিজের ঠিক মধ্যিখানে।

দামাস্কাস থেকে মদিনা পর্যন্ত এই রেলপথটির সামরিক গুরুত্ব তুর্কীদের কাছে অসীম। গোটা আরব দুনিয়া তখন তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ। সিরিয়া, লেবানন, ইস্রায়েল, ইরাক, পশ্চিম আরব—সব। আরবদের বিদ্রোহ দমন করতে আগে ব্রিটিশ শক্তিকে আয়ত্তে আনতে হবে। তার জন্য প্রথমেই চাই লরেন্স-এর মুন্ডুটি। যে এনে দেবে সে পাবে তার যোগ্য মূল্য এমন ঘোষণাও করা হয়েছে।

উপত্যকার একটি জায়গা বেছে নিলেন লরেন্স, যেখানে সবার দৃষ্টির বাইরে থেকে বিস্ফোরণের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এখান থেকেই প্রয়োজনে গুলি চালাতে হবে। অল্প কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দলের আর সবাইকে এখানে রেখে লরেন্স এগিয়ে গেলেন গেলেন রেলপথটি পরিদর্শন করতে। জায়গাটি আকাবা থেকে ৭০ মাইল দক্ষিণে,মুদাওয়ারা স্টেশনের কাছাকাছি। একটা শৈলস্তর বেছে নিয়ে সেখানে রাখলেন কয়েকটি ভারি মেশিন গান ও ট্রেঞ্চ মর্টার (ছোট মাপের চওড়া নলের কামান) দু'জন ব্রিটিশ সার্জেন্ট-এর আজ্ঞাধীনে।

ব্রিজে পেঁছে মাঝামাঝি জায়গায় স্লিপার-এর তলায় লুকিয়ে রাখলেন পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের বিস্ফোরক। খুব সাবধানে, যাতে উপর থেকে কারও চোখে না পড়ে। বিস্ফোরকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া বৈদ্যুতিক তারটি নিয়ে যাওয়া হল খানিকটা দূরে যেখানে বসে সুইচ টিপে দিলে ব্রিজের ওপর বিস্ফোরণটি ঘটবে। তারটি সযত্নে বালি চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা হল। হাপর থেকে হাওয়া দিয়ে বালি সমান করে দেওয়া হল যাতে দেখে বোঝা না যায় এর তলায় কিছু লুকিয়ে রাখা আখে। যেখানে বসে সুইচ টেপা হবে সেখান থেকে ব্রিজটি দেখা যায় না, কাজেই যিনি সুইচ টিপবেন তাঁকে ট্রেন ব্রিজে উঠেছে এই ইঙ্গিতটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সুইচ টেপার কাজটি নিতে প্রায় কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সালেম নামধারী আরব বিদ্রোহের নেতা আমীর ফাইসাল-

এর মধ্যে ক্রীতদাসকেই দেওয়া হল দায়িত্বটি। সঙ্গে সঙ্গে সালেম বসে গেল সুইচ টেপায় হাত পাকাতে।

প্রস্তুতিপর্ব শেষ হতে হতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। শিবিরে ফেরার পথে লরেন্স হঠাৎ সভয়ে দেখলেন তাঁর বাহিনীর কয়েকজন দূরে এক উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে। অতদূর থেকেও তাদের দেখা যাচ্ছে। শত্রুপক্ষও নিশ্চয়ই তাদের দূর থেকেও দেখতে পাবে। লরেন্স চেঁচিয়ে তাদের ডাকলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সত্যিই তাদের দেখতে পেয়েছিল তুর্কীরা, মুদাওয়ারা স্টেশন থেকে। চার মাইল দক্ষিণে হালাত আমার স্টেশন থেকেও তাদের অনেকে দেখতে পায়।

রাত এল। একটা নীচু জায়গায় শিবির স্থাপন করে খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে হালাত আমার থেকে জনা চল্লিশ তুর্কী সৈন্য রওনা হল। লরেন্স ও তাঁর সৈন্যরা এবারে লুকিয়ে থাকাই ঠিক করলেন। এখানেই ছিল মাটির নীচে তাঁদের পাতা কিছু মাইন। দুপুর নাগাদ লরেন্স দূরবীণে চোখ দিয়ে মুদাওয়ারার দিকে তাকালেন। দৃষ্টিতে এল প্রায় ১০০ তুর্কী সৈন্য। তাঁদের দিকে এগোচ্ছে। তখনও তারা কয়েক মাইল দূরে। দুপুরের কড়া রোদে তাদের গতি মন্দ।

পরে এখান থেকে সরে যাওয়াই স্থির করলেন লরেন্স। ভাবলেন মাইনগুলি থাক। তুর্কীদের নজরে পড়বে না বলেই তাঁর আশা। ঠিক এমনি সময় দূরবীণে দেখা দিল দক্ষিণের পর্বতপৃষ্ঠের ওপার থেকে ইঞ্জিনের ধোঁয়া। ট্রেনটি এসে থেমেছে হালাত আমার স্টেশনে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ট্রেনটি ছেড়ে দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আরবরা দাঁড়িয়ে পড়ল তৈরি হয়ে নিয়ে। রাইফেলধারীরা বালিয়াড়ি বরাবর জায়গাটি বেছে নিল। সেখান থেকে লাইনচ্যুত ট্রেনের কামরাগুলি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া যাবে দেড়শ গজ দূর থেকে। মেশিন গান ও মর্টারগুলি আর একটু দূরে পিছনের

দিকে। সালেম উপুর হয়ে বসে সুইচে হাত রেখে। ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। মুখে আল্লার নাম। কাজটি যেন ঠিকমত করতে পারি, এই প্রার্থনা। লরেন্স একটু দূরে অল্প উঁচু এক টিলার উপরে, যেখান থেকে ব্রিজটি স্পষ্ট দেখা যায়। ট্রেনটি ব্রিজ-এ উঠতেই ইঙ্গিত দেবেন। ট্রেনটি ছুটতে ছুটতে একটা বাঁক নিতেই লরেন্স-এর চোখের বাইরে চলে গেল। অবশ্য ধোঁয়া বাষ্প সব দেখা যাচ্ছিল। চাকার আওয়াজও কানে আসছিল। এমন সময় কানে এল আর এক আওয়াজ—রাইফেলের গুলির আওয়াজ। গুলির ঝড় যেন।

গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল এলোপাথাড়ি লক্ষ্যহীন। বুলেটগুলি পাহাড়ের গায়ে লেগে ফিরে আসছিল এদিকে ওদিকে। অবশেষে ট্রেন আবার দৃষ্টিপথে ফিরে এল। দুটি ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া দশটি বক্স ওয়াগন। প্রায় প্রতিটিতে গিজগিজ করছে সৈন্য। জানালা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আছে বন্দুকের নল। প্রতিটি ওয়াগনের ছাতে বালির বস্তার আড়ালে উপুর হয়ে শুয়ে তুর্কী সৈন্য। গুলি চালিয়ে যাচ্ছে বালিয়াড়ির ওপাশে লুকিয়ে থাকা অদেখা শত্রুর উদ্দেশে।

সামনের ইঞ্জিনটি ব্রিজে উঠল। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় ইঞ্জিনটিও উঠল। অমনি লরেন্স ইঙ্গিত দিলেন। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সুইচ চিপে ধরল সালেম। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল এক বিকট আওয়াজে জয়ধ্বনি।

এরপর যা হবার তা হল। কানে তালা লাগানো বিস্ফোরণ-এর সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার মেঘে গোটা ট্রেনটি ঢাকা পড়ে গেল। তার পর এক মুহূর্ত শ্মশানের নৈস্তব্ধ। তার পরই আর্তনাদ—আর্ত-নাদের পর আর্তনাদ। ধোঁয়া খানিকটা কেটে যেতে বিধ্বস্ত ট্রেনটি যেই চোখে পড়ল অমনি লরেন্স-এর লোকেরা সেটি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। আহত তুর্কীরা ট্রেনের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে এদিকে ওদিকে ছুটতে লাগল। আশ্রয়ের আশায়।

ছাতের উপর যারা ছিল তারা মৃত্যু এড়াতে পারল না। কি করে পারবে মেশিনগানের গুলির ওই শিলাবৃষ্টিতে ?

আরবরা ছুটে ট্রেনের কাছে এল। লুঠের নেশায়। কিন্তু তুর্কীদের যারা একটু দূরে একটা বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছিল তারা ওখান থেকে গুলি ছুঁড়ল। কেউ কেউ গুলি ছোঁড়ে ট্রেনের চাকার পিছনে লুকিয়ে। এবার লরেন্স-এর ট্রেঞ্চ মর্টার থেকে ছোঁড়া গোলা তুর্কীদের লুকোবার জায়গা থেকে বার করে নিয়ে এল। তারা পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার মেশিনগানের গুলির শিকার হল। বন্যজন্তুর মত গর্জন করতে করতে আরবরা ট্রেনে উঠে লুঠপাট শুরু করল।

এর মধ্যে লরেন্স-এর চোখ পড়ল, মুদাওয়ারা থেকে যে তুর্কী সেনাদলটি আসছিল ওরা এগিয়ে আসছে। পরে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও অনেক তুর্কী সৈন্য। হালাত আমারের দিক থেকে ওরা আসছে। লরেন্স হিসাব করে দেখলেন, ওদের এখানে পৌঁছতে আধঘণ্টা লেগে যাবে। তখন তিনি ছুটে গেলেন ধ্বংস-প্রাপ্ত ট্রেনটির দিকে। ব্রিজটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। ইঞ্জিনের লাগোয়া গাড়ীটি ভাঙ্গা ব্রিজের এক ফাঁকে আটকে ছিল। কিছু রুগ্ন ও আহত তুর্কী ছিল সেটিতে। সেদিকে তাকিয়ে লরেন্স এক বীভৎস দৃশ্য দেখতে পেলেন। ওই গাড়ীর তিন জন বেঁচে, বাকি সব মৃত। জীবিতদের মধ্যে একজন রুগ্ন, তার গলা দিয়ে ক্ষীণ আওয়াজ বেরোল "টাইফাস।" শুনতে পেয়ে লরেন্স চট করে গাড়ীর দরজাটি বন্ধ করে ওদের অদৃষ্টের হাতে রেখে চলে এলেন।

ইঞ্জিন দুটি পরীক্ষা করে দেখলেন লরেন্স। দ্বিতীয় ইঞ্জিনটি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে প্রথমটি শুধু লাইনচ্যুত। লরেন্স-এর পরিকল্পনা ছিল যতগুলি সম্ভব ইঞ্জিন ধ্বংস করা। সেই অনুযায়ী আরবদের হটিয়ে দিয়ে অক্ষত ইঞ্জিনটির সিলিন্ডারে কিছু বিস্ফোরক গুঁজে অগ্নিসংযোগ করতেই আবার বিস্ফোরণ হল। ইঞ্জিনটি অকেজো হয়ে গেল।

এই অভিযানে আরবদের একমাত্র স্বার্থ ছিল লুঠ। ট্রেন ভর্তি ছিল শরণার্থী, তাদের অনেকে রুগ্ন ও আহত। দামাস্কাসে ফিরছেন এমন কিছু তুর্কী অফিসারের পরিবারও ট্রেনে ছিলেন। এঁদের বেশির ভাগ নারী ও শিশু। আতঙ্কিত এই যাত্রীরা রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কেউ মাথার চুল ছিঁড়ছিলেন। এদিকে আরবরা তাঁদের মালপত্র তছনছ করে খুঁজছে নেবার মত কি আছে। দামী যা পাচ্ছে নিয়ে উটের পিঠে চাপাচ্ছে। যা নিতে পারবে না বা নিয়ে লাভ হবে না—যেমন কার্পেট, তোষক বালিশ, লেপ-কম্বল, বাসনপত্র ইত্যাদি—তা সব লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে। পাগলের মত।

ভয়ে কাঠ তুর্কী নারীদের অনেকে ছুটে আসেন লরেন্স-এর কাছে—তাঁর পোষাক দেখে আরবদের নেতা বলে তাঁকে ধরে নিতে তাঁদের অসুবিধা হয় না। তাঁরা লরেন্স-এর দয়া ভিক্ষা করলেন। লরেন্স আমতা আমতা করে বললেন, সব তো ঠিকই আছে। তুর্কী পুরুষদের কয়েকজন তখন মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লরেন্স-এর পায়ে পড়ে গেলেন। তাঁদের মৃত্যু আসন্ন এই আশঙ্কা করে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। লরেন্স এক রকম লাথি মেরেই তাঁদের সরিয়ে দিয়ে অন্যদিকে পা বাড়ালেন। অমনি কয়েকজন অস্ট্রিয়ান সেনা—এঁদের মধ্যে কিছু কমিশন্ড ও নন-কমিশন্ড অফিসারও ছিলেন—এসে একটা থাকার জায়গা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানালেন। লরেন্স বললেন তাঁদের সঙ্গে কোন ডাক্তার নেই। তবে জানালেন চিন্তার কারণ নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওখানে তুর্কী সৈন্যদল এসে পড়ছে মুদাওয়ারা থেকে তাদের উদ্ধার করতে, তাদের প্রাণ মোটেই বিপন্ন নয়—এই আশ্বাস লরেন্স যখন দিচ্ছেন ঠিক তখনই কয়েকজন আরব অস্ট্রিয়ানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদের লুঠপাটে প্রতিবাদ জানিয়েছিল অস্ট্রিয়ানরা। পরিণামে একজনও বেঁচে রইল না।

তুর্কী সৈন্যরা ততক্ষণে প্রায় এসে পড়েছে। আশ মিটিয়ে

খুন ও লুঠপাট হল, এবারে লুঠের মাল নিয়ে আরবদের পালাবার পালা। লরেন্স ও দুই ব্রিটিশ সার্জেন্ট মিলে মৃত তুর্কীদের একটা হিসাব নিলেন। মৃতের সংখ্যা প্রায় সত্তর। আহত তিরিশ—এদের অনেকেই পরে মারা যায়। অন্তত কুড়ি জনের দেহ মর্টারের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মৃত সৈন্যদের কাঁধের থলে থেকে সোনাদানা ও অনেক কিছু পাওয়া যায়।

যাবার সময় হয়ে এল। তুর্কীরা এসে পড়ল বলে। আরব সৈন্যরা লুঠের মাল নিয়ে আগেই পালিয়েছে। বন্দুক ও ডাইনামাইট সঙ্গে নিয়ে লরেন্স, তাঁর দেহরক্ষী ও দুই সার্জেন্টকে এবার পালাতে হবে। ট্রেনের পিছনের দিকে একটি ওয়াগনে ছিলেন এক বৃদ্ধা আরব মহিলা, লরেন্সকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার বলুন তো ? লরেন্স তাকে বুঝিয়ে বললেন, যুদ্ধ চলছে ইংরেজ-তুর্কীর, যুদ্ধের সময় এই সবই হয়। বৃদ্ধার কথায় জানা যায় তিনি আরব বিদ্রোহের নেতা আমীর ফয়সাল-এর বান্ধবী। এ বয়সে এ অবস্থায় তিনি আর বেশিদূর এগোতে পারবেন না, তার মৃত্যু অনিবার্য একথা তার মুখে শুনে লরেন্স তাঁকে আশ্বাস দেন তুর্কীরা এসে পড়ল বলে, ওরা এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এর বেশ কিছুদিন পর লরেন্স-এর কাছে আসে একটি চিঠি, সঙ্গে একটি উপহার। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়নি প্রেরিকা মদিনার আয়েষা বেগম এই মহিলাই। ক্ষণিকের সেই হঠাৎ দেখার মুহূর্তটি তিনি ভোলেননি, তাই এই উপহার।

রাইফেলের আওয়াজে আকাশ ফাটিয়ে এগিয়ে আসছে তুর্কীদের দুটি বাহিনী। যে ক'জন আরব সঙ্গে রয়েছে তাদের সাহায্যে এদের মোকাবিলা করা যাবে না, অতএব লরেন্স পালাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলেন। সামরিক সরঞ্জাম যা কিছু ছিল তার যতটা সম্ভব এক জায়গায় জড়ো করলেন। প্রচুর সংখ্যার কার্তুজ, অনেকটা পেট্রল ও কাঠকুটো একত্র করলেন। একটু তফাতে সেগুলিকে ঘিরে রাখলেন কয়েকটি লিউইস গান ও ছোট বন্দুকের

গুলি। ওপরে বিছিয়ে দিলেন কিছু ট্রেঞ্চ মর্টারের সেল। তারপর পেট্রলে আগুন দিয়ে সরে পড়লেন।

সেই আগুনে কার্তুজগুলি ফুটতে শুরু করল। দূর থেকে সে আওয়াজ শুনে তুর্কী সৈন্যদের ধারণা হল শত্রুপক্ষের এক বিরাট বাহিনী গুলি চালাচ্ছে। তারা থমকে দাঁড়াল। এগোবার আগে ভাল করে সব দেখে শুনে শত্রুপক্ষের শক্তির একটা মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে হবে। এদিকে পেট্রলের আগুন ছড়াতে ছড়াতে ধরল লিউইস গান ও মর্টার শেলগুলিকে। কানে তালা লাগান এক বিস্ফোরণে তুর্কীরা খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। এই সুযোগে লরেন্স ও সঙ্গিরা নিরাপদে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন, যেখানে তাঁদের উটগুলি বাঁধা ছিল। বাঁধন খুলে যে যার উটের পিঠে চেপে রওনা হলেন সোজা পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে তাঁদের নিরাপদ আস্তানার দিকে।

এ অভিযানে তাঁদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। শুধু সালেমকে হারাতে হয়েছিল। যে সালেম ব্রিজের উপর বিস্ফোরণ ঘটাতে সুইচ টিপেছিল, কাজটি সেরে সেও ছুটেছিল ট্রেন লুঠ করতে। সম্ভবতঃ গুলি খেয়ে ইঞ্জিনের কাছে পড়ে যায়। কেউ কেউ তাই বলে। পরে লরেন্স তাকে খুঁজতে এদিকে ওদিকে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি ও তেরজন আরব উটের পিঠে চেপে বার হন মরু অঞ্চল পেরিয়ে আবার সেই ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার অকুস্থলে। সেখানে ততক্ষণে ট্রেনটি ঘিরে অসংখ্য তুর্কী সৈন্য। এ অবস্থায় সালেম জীবিত থাকলেও তার দেখা পাবার আশা দুরাশা মাত্র। দেখা কেউ পায়ওনি। সেখানে ত নয়ই, অন্য কোথাও নয়।

'ট্রয়' আবিষ্কার

আজ একুশ শতকের দোরগোড়াতে এসেও এদেশে এমন মানুষের সংখ্যা কম নয় যাঁদের বিশ্বাস করানো অসম্ভব যে রামায়ণ-মহাভারত ইতিহাস নয়, পুরাণ। শুধুই গল্প। যার স্থান কাল পাত্র সব কাল্পনিক—বড়জোর সমসাময়িক কিছু বাস্তব চরিত্র ও ঘটনা থেকে নেওয়া। স্বীকার করা যাক তুলনায় বেশি যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দেশগুলি—যেখানে পণ্ডিত না হয়েও সাধারণ শিক্ষিত জনগণ জানেন গ্রীক মহাকবি হোমার রচিত 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' ইতিহাস নয়, কল্পকাহিনী। তা সত্বেও কিন্তু এমন মানুষেরও দেখা সেখানে মেলে যাদের মতে 'ইলিয়াড'-এ বর্ণিত হেলেন-হরণ থেকে ট্রয়ের যুদ্ধ ও তার প্রতিটি ঘটনা সত্য।

বিশেষ করে যাঁর কথা মনে করে এই সব বলা হল, তিনি কিন্তু শুধু বিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হননি। একদিন হঠাৎ তিনি পণ করে বসেন, ট্রয় ছিল, আজও আছে, মাটির নীচে, তাকে আমি খুঁড়ে বার করব। শুধু ওই নগরের ধ্বংসাবশেষই নয়, ওতে লুকিয়ে আছে ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের যে অতুল ঐশ্বর্য তার সবটাই উদ্ধার করব। খোঁড়ার কাজ কোথায় হবে তাও একদিন ঠিক হয়ে গেল।

হাইনরিখ শ্লীমান—ওই ছিল তার নাম—যখন খোঁড়ার কাজে তৈরি হচ্ছেন, তখন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা তাঁর এই পরিকল্পনার কথা শুনে আড়ালে হেসেছিলেন তাকে পাগল মনে করে। প্রত্নতত্ত্ব শ্লীমান-এর এলাকা আদৌ ছিলনা। তাছাড়া ট্রয় নগরের অস্তিত্ব তো শুধু হোমারের কল্পনায়।

হাসবার সময় শ্লীমানেরও একদিন এল। ১৮৭৩-এর এক বসন্ত-প্রভাতে। সেটা ছিল মে মাস। তুর্কীর উপকূলের অদূরে

সেই জায়গাটির নাম হিসারলিক। অনেকটা এলাকা জুড়ে খোঁড়া হয়েছে। যে দিনের কথা বলা হচ্ছে সেদিন সকাল থেকেই খোঁড়ার কাজ চলছে প্রায় ২৮ ফুট গভীরে। ভাল করে আলোও আসছিল না সেখানে। ওই অল্প আলোয় যা কিছু খোঁড়ার সঙ্গে উঠে আসছে তিনি হাতে তুলে নিয়ে দেখছেন। হঠাৎ একটু দূরে কি একটা চোখে পড়তেই তাঁর গলা দিয়ে এক অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে পড়ে। একটু থেমে থেকে চেঁচিয়ে তাঁর স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন। পরমা সুন্দরী তাঁর গ্রীক স্ত্রী সোফিয়া কাছেই ছিলেন, ছুটে এলেন। কী ব্যাপার? "সবাইকে ছুটি দিয়ে দাও, আজ আর খুঁড়তে হবে না। বলে দাও, আমার জন্মদিন আজ, এই মাত্র মনে পড়ল। ওরা চলে যাক। আবার কাল আসবে। কাজ না করেও আজকের পুরো মজুরী ওরা পাবে।"

"এই কথা!" মজুরদের ছুটি দিয়ে সোফিয়া ফিরে গেলেন নিজের জায়গায়। স্বামী যা দেখে চমকে গিয়েছিলেন তাঁর চোখে তখনও তা পড়েনি। সেটি হল এক মিটার লম্বা ও এক মিটার চওড়া এক ধাতুর বাক্স। যা খুলতেই বেরিয়ে আসে সোনা। সে কত কি—সোনার মুকুট, সোনার গয়না, সোনার কাপ, সোনার ভাস। কত তার মূল্য তা শুধু চোখে দেখে বলা অসম্ভব। একটু বাদেই সোফিয়া নেমে তাঁর কাছে এলেন। এসে যা দেখলেন তাতে তাঁরও চক্ষু বিস্ফারিত হল। "শীগগির ছুটে যাও সোফিয়া, তোমার শালটা নিয়ে এস।" বড়সড় লাল রংয়ের শালটি নিয়ে সোফিয়া এলেন, তাতে সদ্য পাওয়া ওই ঐশ্বর্য পুঁটলী করে বেঁধে নিয়ে একরকম টানতে টানতে এসে পেঁছিলেন তাঁদের ভাড়া করা বাড়িতে।

ট্রয় আবিষ্কার করব বলে শ্লীমান তা করেছিলেন। এ কারণে তাঁর প্রাপ্য যা ছিল তাও পেয়েছেন। চিরস্মরণীয় হয়েছেন। এর পর অবশ্য দেখা যায় এ ট্রয় তো নয় হোমারের ট্রয়, যদিও সেই ট্রয়ের কাছাকাছি অনেক পরে গড়ে ওঠা আর এক ট্রয়। সে যাই

হোক, একে খুঁড়ে বার করার কাজটি পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তির ইতিহাসে এক বিরাট স্থান করে নিয়ে থাকবে সর্বকালের জন্য এ নিয়ে তো দ্বিমত থাকতে পারে না!

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, শ্লীমান প্রত্নতাত্ত্বিক বলতে যা বোঝায় আদৌ তা ছিলেন না। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হয়ে বহু দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন। জীবনের মধ্যভাগে এসে হঠাৎ যে ভাবে ট্রয় আবিষ্কারের খেয়াল তাঁর মাথায় চেপে বসল সেও এক বিচিত্র কাহিনী। একটা কথা—ভাগ্যটি তাঁর ছিল খুবই ভাল। জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি। তাঁর জন্ম ১৮২২-এর জানুয়ারী, জার্মানীর পূর্বভাগে, পোল্যাণ্ডের সীমানার কাছে। বাবা ছিলেন আংকেরস্ হাগেন নামে এক গ্রামের ধর্ম-যাজক। ধর্মবিরুদ্ধ কিছু কাজের অপরাধে তিনি পদচ্যুত হলে তাঁর সন্তানদের জীবনে নেমে আসে ঘোর দুর্দিন। স্কুল ছেড়ে দিয়ে জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হয় সবাইকে। হাইনরিখ এক মুদীর দোকানে কাজ নেন। একদিন মস্ত বড় ভারি এক পিপে বয়ে নিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ তার রক্ত বমি হল। কপালগুণেই বলতে হবে, কারণ এটি না হলে মুদী দোকানের কাজ ছেড়ে দেবার প্রশ্ন উঠত না। এবং হয়ত ওখানেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে হত।

একটু সেরে উঠে হাইনরিখ চলে এলেন হামবুর্গ-এ। এর মধ্যে অলপ সময়ে কিছু হিসাব রাখার বিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়ে-ছিলেন, যদিও এ বিদ্যা তাকে কোন কাজ পেতে সাহায্য করেনি। কিন্তু ভাগ্যই আবার সহায় হল। এক জাহাজের মালিকের নজরে পড়ে গেলেন। তাঁর কৃপায় নামমাত্র ভাড়ায় ভেনেজুয়েলায় যাবার সুযোগ পেলেন। রাতারাতি বড়লোক হতে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই তখন সেই সব দেশে লোকে পাড়ি দিচ্ছে। আবার সহায় হল ভাগ্য, এবারে দুর্ভাগ্যের ছদ্মবেশে। যাত্রার শুরুতেই হল্যাণ্ডের উপকূল থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে জাহাজডুবি হল। বেশীর ভাগ

যাত্রীর হল সলিল সমাধি, কিন্তু এক অলৌকিক শক্তি হাইনরিখকে জীবন্ত অবস্থায় রেখে গেল এক বেলাভূমিতে। সেখান থেকে তিনি অ্যামস্টারডাম-এ চলে আসেন। পেয়ে যান সেখানে এক পিওন-এর কাজ।

হাইনরিখের আত্মবিশ্বাস ছিল গভীর। সাফল্য তাঁর এক দিন আসবেই একথা মনে রেখে একটা অতি সস্তা বাসস্থান খুঁজে নিলেন যাতে উপার্জনের বেশিটাই বাঁচানো যায় উন্নতির পথে এগোবার জন্য। তিনি ডাচ ও ইংরিজি শিখতে শুরু করলেন। ছ'মাসেই দুটি ভাষায় তাঁর দখল এল; তখন ধরলেন ফরাসী, ইতালীয়, পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ। মাত্র ২২ বছর বয়সে অ্যামস্টার-ডামের এক নামকরা কোম্পানির অফিসে সোজা গিয়ে বললেন, আমি সাতটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারি, চাইলে প্রমাণ দিতে পারি। একটা ভাল মাইনের চাকরি আমি পেতে পারি কি?

কোম্পানির মলিক লোক চেনেন, একটু বাজিয়ে নিতেই হাইনরিখের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তাঁকে কাজ দিলেন। এক বছরের কিছু বেশি দিন কাজ করার পর তাঁকে রাশিয়া পাঠালেন কোম্পানির প্রতিনিধি করে। হাইনরিখ ইতিমধ্যে রুশ ভাষাও ভাল করে শিখে নিয়েছিলেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এ বসে তিনি নিজের কোম্পানি ও আরও কয়েকটি কোম্পানির হয়ে অর্ডার সংগ্রহ করে নিজের জন্য কিছু কমিশন রাখতেন। কিছুদিনের মধ্যেই এল ঐশ্বর্য, খুলে গেল ভাগ্য।

সঙ্গে অবশ্য দুর্ভাগ্যও এল। বিয়ে করলেন, কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হতে পারলেন না। ভাগ্য, দুর্ভাগ্য নিয়ে দিন কাটছে এমন সময় তাঁর এক ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেলেন। নাম তার লুডউইগ। ক্যালিফোর্ণিয়া গিয়েছিলেন, সে সময়কার সোনা কুড়োতে দৌড়-এ যোগ দিতে। হাইনরিখের চাইতে অনেক বেশি ঐশ্বর্য করে মাত্র ২৫ বছর বয়সে মারা যান স্যাকরামেন্টোতে। ভাইয়ের কবরটি একবার দেখতে হাইনরিখ আমেরিকা রওনা হলেন। সেখানে

গিয়ে ঐশ্বর্য আরও কিছু বাড়ানোও যদি যায় তবেই বা মন্দ কি ?

অনেক ঘুরপথে সেখানে পৌঁছতে হত তখন। অ্যাটলাণ্টিক পেরিয়ে নিউইয়র্ক, সেখান থেকে স্থলপথে পানামা যোজক। তার পর আবার সমুদ্রপথে ক্যালিফোর্ণিয়া। হাইনরিখ পৌঁছবার পরে পরেই ঘটে ১৯৫১-র ভয়ঙ্কর সানফ্রানসিসকো অগ্নিকাণ্ড, যার সাক্ষী তাঁকে হতে হয়েছিল। সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখবার পর তাঁর সমস্যাটি দাঁড়াল কোথায় গিয়ে উঠবেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর স্যাকরামেণ্টোর একমাত্র অদায় অট্টালিকাটির একাংশে থাকবার জায়গা পেলেন। এও সৌভাগ্য বলতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই লেগে গেলেন ঐশ্বর্য সংগ্রহে। স্বর্ণরেণু কেনা-বেচা করে ন' মাসেই তা এসে গেল। বাড়ি ফিরলেন হাইনরিখ।

ফিরে শান্তি পেলেন না। যাকে কোনদিন ভালবাসতে পারেন নি সেই স্ত্রী একাতেরিণার সঙ্গে থেকে শান্তি কোনদিনই পাওয়া যাবে না, অতএব সব ভুলে থাকতে মন দিলেন প্রাচীন গ্রীস-এর ইতিহাসে। গ্রীস সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় সব গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ভাষা—প্রাচীন ও আধুনিক দুইই—শিখে নিলেন। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় লেখা সোফোক্লিস-এর সব কটি নাটক আধুনিক গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করে ফেললেন।

এরই ফাঁকে ফাঁকে করে নিলেন আর এক প্রস্থ ঐশ্বর্য—তখন ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছে, সেই যুদ্ধের বাজারে মুনাফাবাজী করে। বিচিত্র তাঁর জীবন, একথা তো শুরুতেই বলা হয়েছে।

এবারে স্ত্রীকে ফেলে সোজা গ্রীসে চলে আসার প্রয়োজন বোধ করে ওই পথে পাড়ি দিলেন হাইনরিখ। স্বপ্নের সেই দেশে পা দিয়ে চোখের সামনে পেলেন গ্রীসের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ওই অপরূপ সব নিদর্শন। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু চলে যেতে হল, এবারে আবার আমেরিকায়। সেখানে গিয়ে সেখানকার আইনের সাহায্য নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করলেন। ফিরে

এলেন আবার আথেন্স-এ।

এর পরে পরেই এক গ্রীক বন্ধুর সাহায্য নিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, সেই বিজ্ঞাপনের সূত্রে পেলেন নিজের মনোমত স্ত্রী অপরূপা সুন্দরী আথেন্সবাসিনী গ্রীক মহিলা সোফিয়াকে। এ বিবাহ হয় সুখের। সোফিয়া তাঁর দেশের অতীত সম্বন্ধে তাঁর স্বামীর মতই সমান আগ্রহী ছিলেন। হয়ত বা বেশিই। তাঁরও উৎসাহ হোমার-এর মহাকাব্য 'ইলিয়াড' এর পটভূমিকা ট্রয় নিয়ে। ট্রয় সম্বন্ধে সব অজানা তথ্য খুঁজে বার করতে হবে, উদ্ধার করতে হবে তার ঐশ্বর্য। ভাগ্যক্রমে যে স্বামীটি পেয়েছেন তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করে সহজতর হবে ট্রয় আবিষ্কার। হাইনরিখের মাথায় ছিল এ ছাড়াও আর এক চিন্তা। তাঁর বয়স হয়েছে। যাবার সময় এসে গেছে। যাবার আগে ট্রয় আবিষ্কার সম্ভব হলে তাঁর মৃত্যুর পর সোফিয়া তাঁর অর্জিত অগাধ সম্পত্তি তো পাবেনই উপরন্তু পাবেন ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা আরও অনেক ঐশ্বর্য।

শেষ পর্যন্ত ট্রয় আবিষ্কার তিনি করলেনই। আর করলেন বলেই আজকে তিনি বেঁচে আছেন মানুষের স্মৃতিতে। নাহলে হারিয়ে যেতেন আর দশ জনেরই মত কালের অতলে। এই ট্রয় পরে হোমারের ট্রয় নয় প্রমাণিত হলেও যে দক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম এই আবিষ্কারের পিছনে রয়েছে তার মূল্য অপরিমেয়।

খননের কাজে নামবার আগে তাঁকে প্রচুর গবেষণা করতে হয়েছে, যদিও পেশাদার পুরাতত্ত্ববিদ তিনি ছিলেন না, যে কথা আগেই বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে যাঁর কাছে যা কিছু জানবার ছিল তা জেনে নিতে ত্রুটি করেন নি। তাতে এই উপসংহারে আসতে হয়েছিল যে হোমারের ট্রয় যদি থেকেই থাকে তবে তা আছে তুর্কীর উপকূলের দশ মাইল দূরে আধুনিক শহর বুনারবাসির কাছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে ঘুরে ফিরে সব দেখে তাঁর মন বলল, না এখানে নয়। তাঁর ভিতরে কি একটা অনুভূতি এল, তারই প্রেরণায়

তিনি চলে গেলেন কয়েক মাইল দূরে, হিসারলিক পাহাড়ের নীচে।

"এইতো, এখানেই—" বলে খোঁড়ার কাজে লেগে গেলেন। আর ওখানেই পেয়ে গেলেন যা খুঁজছিলেন এতকাল—স্বামী স্ত্রী দুজনের মিলিত চেষ্টায়।

আবিষ্কারের পর সমস্যা দেখা দিল, উদ্ধার করা ঐশ্বর্য নিজ অধিকারে রাখা নিয়ে। লোভী তুর্কীদের হাত থেকে সব রক্ষা করতে হবে—ওই ঐশ্বর্যের উপর তাদেরই যে অধিকার, তাদের দেশে পাওয়া গেছে বলে। হাইনরিখ ও সোফিয়া দুজনে অতি সাবধানে শালে জড়ানো সেই সোনার জিনিষপত্রের বোঝাটি টানতে টানতে নিয়ে গেলেন যেখানে তাঁদের থাকবার জায়গা ছিল সেখানে। তার পর একটি একটি করে সরিয়ে তা পাঠিয়ে দিতে থাকলেন যেখানে তাঁদের যত বন্ধু ছিল তাঁদের বাড়িতে।

এরপর বেশ কয়েক বছর লাগল সবগুলিকে আবার একত্র করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে। এবারে নিশ্চিন্ত। অবশেষে সব কিছু চিরকালের মত নিজ অধিকারে এসে গেছে। অবশ্য এ ঐশ্বর্যে তাদের প্রয়োজনই বা ছিল কি। এর আবিষ্কারের কৃতিত্ব সবার স্বকৃতি পাবে, এছাড়া আর কিছু তাঁদের চাইবার ছিলনা।

এর পরও তিনি আরও কিছু খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করেছেন। যদিও তাঁর মূল্য তাঁর নিজের কাছে এমন কিছু ছিল না। এই খোঁড়াখুঁড়ি হয় গ্রীসেরই মাটিতে। আবিষ্কৃত হয় প্রাচীন মিসিনা, যে নগরের পত্তন হয়েছিল খৃষ্টজন্মের কয়েক হাজার বছর আগে।

তাঁর উদ্ধার করা সব ঐশ্বর্য বার্লিনের যাদুঘরে রাখা হয়েছিল। জার্মানীর তখনকার যুবরাজ উইলহেলম, যিনি পরে হন কাইজার দ্বিতীয় উলহেলম, সখের প্রত্নতাত্ত্বিক শ্লীমান্ দম্পতীর সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। বার্লিন যাদু-ঘরেই সব কিছু ছিল অনেক কাল ধরে, শ্লীমানের মৃত্যুর পরও।

ওখানেই চিরকাল থাকবে এই আশা নিয়েই ১৮৯০-তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ানরা সব কিছু বার্লিন যাদুঘর থেকে নিয়ে যায়। আজ রাশিয়ানরাই শুধু জানে ট্রয়ের সেই ঐশ্বর্য এখন কোথায়। অথবা জানেনা। হয়ত এতদিনে সব ভুলে বসে আছে।

দুর্গম লাসায় প্রথম ইংরেজ

১৯০৩ সাল। কর্ণেল ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ড চলেছেন নিষিদ্ধ নগরী লাসার দিকে। তখনও তিব্বত নামটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রহস্য আর ভীতি। পথও ছিল রীতিমত দুর্গম, আর অজানা। এছাড়া কর্ণেল ইয়ং হাজব্যান্ডের কাছে যখন তিব্বত অভিযানের আদেশ এলো তখন ভারত সীমান্তের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। তিব্বতের সৈন্যদল সিকিম রাজ্য আক্রমণ করেছে। ভারতের তৎকালীন লর্ড কার্জনের দেওয়া হুঁসিয়ারীতে তারা কর্ণপাত করছে না।

তার ওপর বাতাসে উড়ছে নানা গুজব। কেউ বলছে রাশিয়ার জারের গোপন উসকানি পেয়ে তিব্বতের সাহস বেড়ে গেছে। রাজনৈতিক আর বাণিজ্যিক চুক্তি করে জার চাইছেন ভারতের দোরগোড়ায় নিষিদ্ধ নগরীতে সামরিক ঘাঁটি গড়তে। আবার কেউ বলছিল, এর পেছনে আছে চীনের মদত।

এক কথায় লাসায় না গিয়ে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। তিব্বতের আসল অভিপ্রায়টা কি। তাই লর্ড কার্জন ঠিক করলেন কর্ণেলের নেতৃত্বে একটি শুভেচ্ছা মিশন পাঠাতে হবে তিব্বতে। তারা সাবধানে খতিয়ে দেখবে সব কিছু। তারপর গোপন রিপোর্ট পাঠাবে সরকারের কাছে।

ইয়ং হাজব্যান্ড তখন রয়েছেন রাজকীয় ড্রাগন রক্ষী দলে। তাঁর সামরিক শিক্ষা স্যান্ডহার্স্ট শিক্ষালয়ে। ব্যক্তিত্বে ঐ তরুণ উজ্জ্বল ও প্রখর। অথচ মানসিকতার দিক থেকে কিছুটা মিস্টিক ধরণের! হিমালয়ের ঐ অঞ্চলের মানুষদের জীবনধারা, আচার-আচরণ আর ভাষা সম্পর্কে ভালো রকম জ্ঞান রয়েছে ঐ তরুণ অফিসারের। তাছাড়া দুর্গম পাহাড়ী পথে চলাফেরার তালিমও নিয়েছেন তিনি। তাই বাছাই-এ কোন ভুল হয়নি।

তিব্বত যাত্রার আদেশ পাওয়া মাত্র ইয়ং হাজব্যান্ড চলে গেলেন দার্জিলিং-এ। সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন এক ব্যাটেলিয়ন গুর্খা সৈন্য ও এক কোম্পানী স্যাপার আর মাইনার (পথ তৈরীতে বিশেষজ্ঞ কর্মী দল)। সেই সঙ্গে পাহাড়ে তোলার উপযোগী দুটি বিশেষ কামান, দুটি ম্যাক্সিম কামান এবং আরও দুটি সাত পাউন্ড গোলা-বর্ষণের উপযোগী দূর পাল্লার কামান। আরও রইল বেশ কিছু শেরপা, কুলী এবং কয়েক ডজন মাল বহনের উপযোগী চমরী গাই।

কর্ণেল হাজব্যান্ড ঐ মিশনের নেতৃত্ব দিলেও যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে। তবে কর্ণেলের কাছ থেকে সবুজ সংকেত না পেলে তাঁর এক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ারও উপায় ছিল না। সরবরাহ আর মাল পরিবহনের দায়িত্ব রইল মেজর ব্রেদেরটনের ওপর।

তিব্বতকে তখন বলা হতো 'পৃথিবীর ছাদ'। পশ্চিম দুনিয়া তো দূরস্থান, ভারতের সঙ্গেও তার কোন সংযোগ ছিল না। লাসা ছিল নিষিদ্ধ নগরী।

তেমন একটি অজানা, রহস্যঘেরা দেশে পেঁছিতে হবে ইয়ং হাজব্যান্ডকে। তার প্রস্তুতি শুরু হল জুন মাস নাগাদ। যখন জোর কদমে তোড়জোড় চলছে তখন হঠাৎ মড়ক লাগলো চমরী গাইয়ের মধ্যে। কিছুটা পেছিয়ে গেল যাত্রা শুরুর তারিখ। এর মধ্যে আবার ডাক এল সিমলা থেকে। খার্তুম অভিযানের বিখ্যাত সেনাপতি কিচেনার কথা বলতে চান কর্ণেলের সঙ্গে। সেই বৈঠক সেরে ফিরে এসে ইয়ং হাজব্যান্ড আবার ঢেলে সাজালেন তাঁর বাহিনীকে। নতুন করে যুক্ত হল দু'কোম্পানী রাজকীয় গোলন্দাজ আর ভারতীয় সেনানীর বদলে এলো গোরা সৈন্য।

বসন্তকাল কবে আসবে তার জন্যে আর অপেক্ষা করতে রাজি নন কর্ণেল। উনি তিব্বতীদের দেখিয়ে দিতে চান যে দুরন্ত শীত বা ভয়ঙ্কর তুষারপাত ব্রিটিশদের দমিয়ে দিতে পারে না;

তাঁদের শুভেচ্ছা এমনই নিখাদ যে সেটা জানানোর জন্যে তাঁরা প্রকৃতির বাধা টপকে ছুটে এসেছেন। তাই শীত নিবারণের জন্যে তিনি অর্ডার দিলেন ভেড়ার চামড়ার পোষাকের। ঐ পোষাক, রসদ সব জোগাড় হল। দু'-হাজার সৈন্যও তৈরী। তাদের সাহায্য করার জন্য তৈরী বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত আরও চার হাজার মানুষ। যে পথে দূর-দুর্গম লাসায় গিয়ে পেঁছতে হবে সেটির উচ্চতা গড়পড়তা ভাবে প্রায় ১২ হাজার ফুট। তার ওপর কোন ম্যাপ নেই। ভাল রাস্তাও নেই।

তবু ৪০ বছর বয়সী কর্ণেল একটুকুও দমলেন না। স্যান্ড-হার্স্ট-এ থাকার সময় তিনি কঠোর ট্রেনিং নিয়েছেন। সহন-শীলতার যত রকম পরীক্ষা হতে পারে তা'ও পাস করেছেন। এখন দিতে হবে সাহস, ধৈর্য, উপস্থিত বুদ্ধির অগ্নিপরীক্ষা।

১৪,৪০০ ফুট উঁচু 'জেলাপ-লা পাস' সারা বছর বরফে মোড়া থাকে। শীতের সময় ভারতের দিক থেকে ঐ গিরিবর্ত্ম তখনও কেউ পার হবার চেষ্টা করেনি। সেই অসাধ্য সাধন করতে হবে ইয়ং হাজব্যান্ডকে।

যা ভাবা সেই কাজ। তবে সব সময় সব কাজে ঠান্ডা রাখতে হয় মাথা। কর্ণেল সে বিষয়ে সচেতন। একটা ঘটনার কথা বলি। ইয়াটুং-এর কাছে দুধারে বরফে ঢাকা খাড়া পাহাড়। সংকীর্ণ গিরিপথে কোন মতে এক একজন এগিয়ে যেতে পারে। সেই অবস্থায় সারিবদ্ধ ভাবে সেনাদল তো এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ ঐ বাহিনীর ওপর পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু হল অবিশ্রান্ত পাথর বর্ষণ। তিব্বতী ডাকাতেরা অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। সংখ্যায় তারা কয়েক হাজার। এখন উপায়?

কর্ণেল একটুও দমলেন না। পাথরের ঘায়ে যারা লুটিয়ে পড়েছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এগিয়ে গেলেন অবরুদ্ধ গিরিবর্ত্মের মুখে। পাথর চাপা পড়ে অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ। সেই পাথরের দেয়ালে স্যাপার বাহিনী একটি গর্ত করে দিল।

সেই গর্ত দিয়ে পাহাড়ি ঘোড়ার পিঠে চেপে ইয়ং হাজব্যান্ড ঢুকে পড়লেন শত্রুপুরীতে। ঢোকা মাত্র তিব্বতী ডাকাতেরা ঘিরে ধরলো তাঁকে। তাদের প্রত্যেকের হাতে উদ্যত খরসান অস্ত্র। ওদের একজন তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে চেপে ধরলো ওঁর লাগাম। কর্ণেল তার দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করলেন না। শান্ত ভাবে রেকাবে পা না দিয়েই এক লাফে নামে পড়লেন তিনি। তারপর মৃদু হেসে তিব্বতী কায়দায় ওদের এমন ভাবে অভিবাদন জানালেন যেন কিছুই হয়নি। পরে দেখা গেল যাদের ভাবা হয়েছিল ডাকাত তারা আসলে স্থানীয় গ্রামবাসী। ভয় পেয়েই তারা আক্রমণ করেছে। ওরা যুদ্ধ করতে চায় না।

এইভাবেই ইয়ং হাজব্যান্ড পথ চলতে চলতে স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করলেন। তিব্বতী ভাষায় তিনি সমবেত গ্রামবাসীদের জানালেনঃ আমরা এসেছি শান্তি স্থাপনা করতে, তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে। গোরা সাহেবের মুখে তিব্বতী ভাষায় বক্তৃতা শুনে অবাক হয়ে গেল স্থানীয় মানুষেরা। তবে তারা এরপর থেকে সহযোগিতা করলেও প্রকৃতি হয়ে উঠলো ঐ অভিযানের বৈরী। ভয়ংকর তুষার-ঝঞ্ঝা, প্রবল শিলাবৃষ্টি, কখনো বা পাহাড়ী ধ্বস ব্যাহত করলো অভিযানের গতি। প্রচন্ড জল কষ্ট ভোগ করতে হলো তাদের। তৃষ্ণার্ত অভিযাত্রীরা স্থানীয় মানুষজনের কাছে জানতে পারলেন নিকটেই আছে বেশ বড় একটি ঝর্ণা। পাকদন্ডী পথ ভেঙে তখনই ছুটে গেলেন সবাই। গিয়ে দেখেন গোটা জলপ্রপাতটাই বরফ হয়ে জমে গেছে। বরফ কাটা কুড়ুল দিয়ে খুঁড়ে, আগুনে বরফ গালিয়ে তবেই মেটানো গেল তৃষ্ণা।

ইয়ং হাজব্যান্ড এতেও দমবার পাত্র নন। তিনি পনের হাজার দু'শো ফুট উঁচু টক্‌লা গিরিবর্ত্ম পার হয়ে পেঁছালেন টুনাতে। সেখানে তাপমান তখন হিমাঙ্কের ৫০ ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে। অতিশয় সংকীর্ণ আর গবাদি পশুর মলমূত্রে দুর্গন্ধময় সেই স্থান, তবু সেখানেই তাঁবু ফেলে বিশ্রাম নিতে হল কিছুক্ষণ। এখানেই

কষ্টের শেষ নয়। পরদিন সকাল ১১টা নাগাদ শুরু হল প্রচণ্ড তুষার ঝড়। ছুরির মতো তীক্ষ্ণ বরফের কুচি আর বৃষ্টির ছাঁট এসে বিঁধতে লাগালো অভিযাত্রীদের সর্বাঙ্গে। পর পর বেশ কয়েকদিন ঐ একই সময় ঝড় তাঁদের নাজেহাল করে তুললো। কর্ণেল তাতে ঘাবড়ালন না। তিনি ঠাট্টা করে বললেনঃ ঝড়ের সঙ্গে তোমাদের ঘড়িগুলো মিলিয়ে নাও। ওটা প্রতিদিনই ঠিক এগারোটার সময় আসছে।

আর এক সমস্যা দেখা দিল—কুহেলি আর কুয়াশা। কয়েক হাত দূরের মানুষও দেখা যায় না। পথে অগ্রসর হওয়া তাই অসম্ভব। দরকার না থাকলেও আটকে পড়তে হয় এক এক ঘাঁটিতে। তাঁবুর বাইরে যারা প্রহরায় থাকতো তারা ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যাবার উপক্রম। তাই ইয়ং হাজব্যাণ্ড ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাহারা বদলের ব্যবস্থা করলেন।

যতই বাধা আসুক পাহাড়ী পথে শম্বুক গতিতে এগিয়ে চললো অভিযাত্রীদের নীরব মিছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এসে পৌঁছলেন নিষিদ্ধ নগরী লাসার কাছাকাছি। ঠিক সেই সময় দূত মারফত একটা খবর এল—তৎকালীন দলাইলামা নাকি শান্তি মিশনের নেতার সঙ্গে কথা বলতে রাজী আছেন। তাই শুনে ইয়ং হাজব্যাণ্ড লাসায় পাঠালেন রাজনৈতিক উপদেষ্টা ক্যাপটেন ওকনার সাহেবকে। কিন্তু ওকনারকে লাসায় ঢুকতে দেওয়া হল না। তিব্বতী কর্মচারীরা তাঁকে জানালো: এখনই দলবল নিয়ে ইয়াকুনে ফিরে যাও। আর এক পা লাসার দিকে অগ্রসর হলেই আমাদের সেনাদল তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পরদিন ভোরে শিবিরে যখন বিপদের ছায়া তখন হঠাৎ শোনা গেল ইয়ং হাজব্যাণ্ডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হেড কোয়ার্টারে সবাই আতংকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরদিনই অতর্কিতে আবার ফিরে এলেন ইয়ং হাজব্যাণ্ড। তিনি তিব্বতীয়দের সঙ্গে সরাসরি নিজেই কথা বলতে গিয়েছিলেন। তাঁর তিব্বতীয়

পোশাক, আচার আচরণ ও মুখের তিব্বতী ভাষা শুনে উচ্চপদস্থ লামারা কিছুটা অবাক আর সন্তুষ্ট হলেও তাঁদের টলানো গেল না। তাঁরা জানালেন লাসা পৃথিবীর সব দেশের কাছে নিষিদ্ধ! তাই ইংরেজরা ওখানে ঢুকতে পাবে না। হাজব্যাণ্ড হাসি মুখে সায় দিলেন। তারপর ঢোঁক গিলে বললেন ঃ কিন্তু ভাই, রুশিদের তো তোমরা ঢুকতে দিয়েছো। তারা কি বিদেশী নয়? ঐ কথার জবাব মিললো না। ওরা এড়িয়ে গেল।

এরপর খবর এল তিব্বতী সৈন্যদলের এক জেনারেল টুনাতে গেছেন। ইয়ং হাজব্যাণ্ড ছুটলেন তাঁর কাছে। কিন্তু তিনিও ওই শান্তি মিশনের মৈত্রী অভিপ্রায়কে মেনে নিতে পারলেন না। আদেশ করলেন : 'তিব্বত ছেড়ে এখনই চলে যাও।' এর মধ্যেই খবর এল অভিযাত্রী দলকে ধ্বংস করার জন্যে গোপনে 'গুরু' এলাকায় তিব্বতীরা সেনা সমাবেশ করছে। তাই শুনে কর্নেল রাতে ডবল পাহারার ব্যবস্থা করলেন তাঁবুর চারিদিকে। কিন্তু টুনা ছেড়ে নড়লেন না। নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইলেন তিব্বতী সেনাপতির পিছনে। পরদিন হঠাৎ এক লামার উসকানিতে তিব্বতী জেনারেলটি খেপে উঠলেন। কোমরবন্ধ থেকে বার করলেন তাঁর রিভলবার। তারপর আচমকা গুলি করলেন এক গোর্খা সেপাইকে। এর ফলে বেধে গেল লড়াই। মারা পড়লো তিন শো'র মতো স্থানীয় মানুষ। দু'জন ইংরেজ আহত হল মারাত্মক ভাবে। তাঁরা এই সংঘাতকে প্রাণপণে এড়িয়ে এসেছেন এতদিন। কিন্তু হঠাৎই তার মুখোমুখি হতে হল শান্তি মিশনকে। টুনাতে চটজলদি খোলা হল কিন্তু হাসপাতাল। সেখানে আহতদের চিকিৎসার জন্য রেখে কর্নেল এগিয়ে চললেন লাসার দিকে। তিব্বতীরা এতদিনে বুঝেছে ভয় দেখিয়ে, বল-প্রয়োগ করে এদের অভিযান ঠেকানো যাবে না। তবু গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় তারা বাধা দিতে থাকলো অনবরত। সেই অবস্থাতেই অভিযাত্রী দল পার হয়ে গেল গি-এণ্ড-সে গিরি সংকট।

সেখানে কোন তিব্বতীয় কর্মকর্তার দেখা মিললো না। অগত্যা ইয়ং হাজব্যাণ্ড নিজে অল্প সংখ্যক সঙ্গী নিয়ে তাঁবু গাড়লেন লাসার ঐ প্রবেশ পথে। বাকি সৈন্যদলকে এগিয়ে যেতে বললেন ১৬,২০০ ফুট উঁচু 'কারোলা পাসের' দিকে। সেখানে আর এক প্রস্থ লড়াই বাধলো। ভারতীয় ও ইংরেজ সৈনিকরা অতো উচ্চতায় ভালো করে শ্বাস নিতেই পারছিল না। তবু লড়াই চালিয়ে গেল তারা। এবং জিতলোও।

এইভাবে যখন যুদ্ধ চলছে তখন হঠাৎই ৮০০ তিব্বতী সৈন্য পিছন থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লো ইয়ং হাজব্যাণ্ডের শিবিরে। রাতের অন্ধকারে। তাঁবুর মধ্যে তখন সবে সকলের চোখে একটু ঘুম এসেছে। তখনই গুলি গোলার শব্দ। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন ইয়ং হাজব্যাণ্ড। হাতে তুলে নিলেন পাশে রাখা রাইফেল। গোর্খা সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিহত করলেন সেই অতর্কিত আক্রমণ। রাতের অন্ধকারে তিব্বতীরা বুঝতে পারলো না কর্ণেলের কাছে সঠিক কত সৈন্য আছে। তারা খানিক-ক্ষণ যুদ্ধ করে, গোর্খাদের হাতে মার খেয়ে পিছু হঠে গেল। ভোরবেলা দেখা গেল শিবিরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে ২৫০টির মতো মৃতদেহ। বলা বাহুল্য তার অর্ধেক সৈন্যও ছিল না ইয়ং হাজব্যাণ্ডের শিবিরে!

এইভাবেই লাসার দিকে এগিয়ে চললো শান্তি মিশন। মানুষের ও প্রকৃতির বাধা কোন কিছুই তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। কিন্তু তবু বুঝি শেষ রক্ষা হয় না। কারণ দুর্জয় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এসে থমকে দাঁড়াতে হল তাদের। কি করে এই দুরন্ত পাহাড়ী নদী পার হওয়া যায়? তখন এগিয়ে এলেন ইঞ্জিনিয়া-রেরা। দড়িতে কায়দা করে বেঁধে দিলেন দু'টি ফেরি নৌকা। এক একটি লম্বায় ৪০ ফুট, চওড়ায় ১২ ফুট। তাতে করে এক এক বারে পারাপার হল ১০০ জন মানুষ। এছাড়াও পশুদের জন্য আর মাল পরিবহনের প্রয়োজনে বানানো হল ভেলা। দড়ি ধরে

ধরে সেই নৌকা আর ভেলায় নদী পার হতে কেটে গেল প্রয়ে তিন দিন। মালপত্র আর ইয়াকগুলোকে নিয়ে যেতে লাগল দু'টো দিন। দুরন্ত স্রোতে নৌকা উল্টে এরমধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলেন মেজর ব্রেদেরটন। সেই সংগে তাঁর গোর্খা দেহরক্ষী। মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড জলের তোড়ে ভেসে গেলেন তাঁরা। এই মেজর ছিলেন শান্তি মিশনের পরিবহন অফিসার। তাঁকে হারিয়ে সকলেই বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। কিন্তু যাত্রা থামলো না। অবশেষে ৩রা আগষ্ট দূর থেকে দেখা গেল দলাই লামার পোতালা প্রাসাদ। হালকা সোনালী রোদে ঝলমল করছে নিষিদ্ধ নগরী। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। থাকে থাকে উঠে গেছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ। ঘরের ছাদগুলি সোনালী রঙের। হাজার হাজার সিঁড়ি উঠে গেছে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত। কিন্তু পোতালাতে পেঁাছে ইয়ং হাজ-ব্যাণ্ডকে হতাশ হতে হল। স্থানীয় কর্মচারীরা জানাল দলাইলামা মঙ্গোলিয়ায় চলে গেছেন। তবে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা বা সীলমোহর তিনি ন্যস্ত করে গেছেন ৪জন মন্ত্রীর ওপর। ইয়ং হাজব্যাণ্ড তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। দু' সপ্তাহ ধরে চললো আলোচনা। কর্ণেল নানাভাবে বোঝালেন, তাঁরা যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছেন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে।

অনেক টালবাহানার পর ৬ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত হল মৈত্রী চুক্তিপত্র। তাতে পড়লো দলাইলামার সীলমোহর। ডাকহরকরার মাধ্যমে সেই খবর তখনই পাঠানো হল সিমলায়।

এর পরেও আরও দু'সপ্তাহ অভিযাত্রীরা লাসায় থেকে গেলেন। বিচক্ষণ ইয়ং হাজব্যাণ্ড নানা ধরণের প্রয়োজনীয় উপহার দ্রব্য সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। উদার হাতে সেগুলি রাজ-কর্মচারী আর লামাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস, সন্দেহ আর ঘৃণার বরফ গললো। তখনও পর্যন্ত বাইরের দুনিয়ায় আর কোনও মানুষ যে দৃশ্য দেখার সুযোগ পায়নি সেটা দেখার আমন্ত্রণ পেলেন ইয়ং হাজব্যাণ্ড। তাঁকে নিয়ে

যাওয়া হল দলাইলামার খাসমহলে। কয়েক সপ্তাহ আগেও যারা ছিল প্রবল শত্রু বিদায়ের কালে দেখা গেল সেই তিব্বতীরাই অভিযাত্রীদের সঙ্গ ছাড়তে চাইছে না।

ফেরার পথেও ইয়ং হাজব্যাণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করছিল এক বিরাট চমক। কয়েক মাইল পথ পাড়ি দেবার পর অভিযাত্রীরা দেখলো পথের ধারে রঙীন সামিয়ানা খাটিয়ে কারা যেন তাদের জন্যে নানা খাদ্য আর পানীয় সাজিয়ে রেখেছে। ওরা সবাই সাধারণ তিব্বতী গ্রামবাসী। যারা ইয়ং হাজব্যাণ্ডকে একটু চোখের দেখা দেখতে চায়। তাঁর সঙ্গে দু'টো কথা বলতে চায়।

তিব্বতী বন্ধুদের সঙ্গে বিরাট একটা পাথরের ওপর বসে স্থানীয় মদ আর পিঠে খেতে খেতে অমন সাহসী, দৃঢ়চেতা ইয়ং হাজব্যাণ্ডেয় চোখেও সেদিন জল এসে গেল।

যুদ্ধ জিতিয়েছিল যে মৃতদেহ

যুদ্ধের সময় এক বিচিত্র উপায়ে শত্রুশিবিরের গোপন খবর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তা নিয়ে লেখা হয়েছে কত গল্প, উপন্যাস, নাটক; তৈরি হয়েছে ছায়াছবি। যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করতে, অন্তত পরাজয় এড়াতে, সৈন্য ও অস্ত্রবল ছাড়াও চাই শত্রুপক্ষের শক্তি, গতিবিধি ও রণকৌশল সম্পর্কে আগাম জ্ঞান। সংগ্রহ করতে প্রয়োজন বুদ্ধির। কতটা বুদ্ধির ? এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি অধ্যায়ে। যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেন-এর মিলিত মিত্রশক্তি শিবিরের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের খবর জার্মান বাহিনীর কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পড়ে। সেই খবর অনুযায়ী জার্মানরা তাদের আগের পরিকল্পনা বাতিল করে নতুন কৌশল নেয়, যা যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় এগিয়ে আনে।

আসলে মিত্রশক্তি শিবিরের এই খবর জার্মানরা চেষ্টা করে সংগ্রহ করেনি। এটি তাদের হাতে এসে পড়েছিল। তারা ধরতে পারেনি খবরটি মিথ্যা এবং তাদের যাকে বলে ‘খাওয়ানো’ হয়েছিল। আর খাওয়াতে পেরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ইনটেলিজেন্স বিভাগ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল তার তুলনা ইতিহাসে নেই বললেই চলে।

গোটা প্ল্যানটা ছকেছিলেন ওই বিভাগের লেফটেনান্ট কমান্ডার ইউয়েন মন্টেগু (Ewen Montagu)। আরও বিচিত্র, এই ভুয়া তথ্য জার্মানদের “খাওয়ানো” হয়েছিল যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্রিটিশ নাগরিকের হাত দিয়ে তিনি জানতেও পারেননি দেশের কত বড় এক উপকার তাঁর হাত দিয়ে হতে যাচ্ছে। কারণ হাতটি ছিল তাঁর মৃতদেহের।

গোটা ব্যাপারটা সরকারি ভাবে গোপন রাখা হয়েছিল দশ বছর। কিন্তু নানা ফাঁক দিয়ে সবই একটু একটু করে লোকের কানে আসতে থাকে। একদিন সব বইয়ের দোকানে দেখা যায় এক উপন্যাস যার দেশপ্রেমী নায়কের স্বপ্ন ছিল দেশের হয়ে যুদ্ধে যাওয়া। যাওয়া হয়না স্বাস্থ্যের কারণে। ভগ্নহৃদয়ে মারা গেলে পর তাঁর দেহ ব্যবহার করা হয় শত্রুপক্ষকে ভুল পথে চালিত করতে। এর পরই জার্মানদের কিছু লেখায় এই ঘটনার উল্লেখ চোখে পড়তেই কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। সরকারী ভাবে পুরো সত্য প্রকাশ না করলে ঘটনার সঙ্গে গুজব মিশে গিয়ে আখেরে ব্রিটেনেরই ক্ষতি হবে। সরকারের অনুমতি পেয়ে মন্টেগু গোটা ব্যাপারটা জনসাধারণের সামনে আনতে একটি বই লিখলেনঃ "দি ম্যান হু নেভার ওয়াজ।" এর উপর একটা ফিলমও তৈরি হল।

এবারে যা হয়েছিল তাতে আসা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর নেতৃত্বে "অ্যাক্সিস্" শক্তির প্রথম বিরাট পরাজয় হয় উত্তর আফ্রিকায়, যার পরিণতি টিউনিসিয়াতে ফিল্ড মার্শাল রোমেল-এর পশ্চাদপসরণে। মিত্রশক্তির এই সাফল্যের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারিত হল সিসিলির পথে ইটালি আক্রমণ। জার্মানরাও এটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। সেই মত তারা সিসিলিতে বিপুল সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করবার আয়োজনে মনও দিয়েছিল। জানতে পেরে মন্টেগু ভাবতে বসলেন। কি করে জার্মানদের সিসিলি থেকে সরিয়ে আনা যায়। সিসিলির পথে এগোবার প্ল্যান মিত্রশক্তি বাতিল করে দিয়েছে এমন একটা ধারণা জার্মানদের মাথায় ঢুকিয়ে বদ্ধমূল করে দিতে পারলে কাজ হবে নিশ্চয়ই।

এ ধরনের কাজে ভূয়া দলিলপত্র সমেত একটি মৃতদেহ ব্যবহারের কল্পনা মন্টেগুর মাথায় আগেও এসেছিল। তবে কাজটি নিখুঁত ভাবে করা খুবই কঠিন। সামান্যতম ফাঁক থেকে গেলেই জার্মানদের মনে সন্দেহ দেখা দেবে। তখনই সব ভেস্তে যাবে। মৃতদেহটিকে এক অফিসারের ইউনিফর্ম পরাতে হবে। সঙ্গে এমন

সব কাগজপত্র দিতে দিতে হবে যার যথার্থতা সম্পর্কে কারও মনে কোন রকম প্রশ্ন আসবার সম্ভাবনাই থাকবেনা। এবং যা পড়ে সবাই ধরে নেবে দেহটি উপর মহলের অতি বিশ্বাসভাজন এক অফিসারের। ওই কাগজপত্রেই থাকবে সিসিলির বদলে অন্য জায়গা থেকে পরবর্তী আক্রমণের সিদ্ধান্তের কথা। মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হবে সাগরে। ভাসতে ভাসতে স্পেন-এর উপকূলে এসে ঠেকবে। দেখে মনে হবে বিমান দুর্ঘটনার শিকার। স্পেন-এ জার্মানরা ময়না তদন্ত করে দেখবার সুযোগ পাবে না, যেমন পেতে পারত ফ্রান্স-এ। তবে তারা দলিলগুলি অবশ্যই ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবে।

কিন্তু এমন একটি দেহ পাওয়া যাবে কোথা থেকে? প্রথমত ঠিক বয়সের হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত দেখে মনে হওয়া চাই দেহ সাগরে পড়ে যাওয়া কোন বিমান যাত্রীর। সবই না হয় চাহিদামত হল, কিন্তু যদি স্পেন-এর কর্তৃপক্ষ ময়না তদন্ত করে, যদি তাতে ধরা পড়ে যায় এটা বিমান দুর্ঘটনার কেস নয়?

তাছাড়া আরও প্রশ্ন আছে। চাহিদামত দেহ না হয় পাওয়া গেল। কেনই বা যাবে না, বিশেষকরে যুদ্ধের সময়? কিন্তু তাতেই বা কি? মৃতের আত্মীয়দের অনুমতি পাওয়া যাবে কি তাদের প্রিয়জনের দেহ ওই রকম এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার? একবার গোরস্থান থেকে লুলিয়ে চুরিয়ে কবর খুঁড়ে একটি দেহ বার করে নেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করতে হলনা। কাছাকাছি বছর তিরিশের এক যুবকের নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হল। তার আত্মীয়দের কাছে কথাটা পাড়তেই তাঁরা রাজি হলেন। নিউমোনিয়ার কারণে মৃতের ফুসফুসে জল জমেছিল। দেহটি সাগরে পাওয়া গেলে ওই জল সাগরের জল বলেই ধরে নেওয়া হবে। অন্ততঃ তা যে সাগরের জল হতে পারে না এমন কথা জোর দিয়ে বলবার মত দক্ষ অভিজ্ঞ ডাক্তার স্পেন-এ নেই, এই আশ্বাসও একজনের কাছে পাওয়া গেল।

ওই মৃতদেহ জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হবে শুধু এইটুকুই আত্মীয়দের বলা হয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়। উদ্দেশ্য গোপনীয়তা রক্ষা করা। দেহ যথারীতি কবর দেওয়া হবে, অবশ্য অন্য নামে, এ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। আত্মীয়রাও চেয়েছিলেন মৃতের পরিচয় অজ্ঞাত রাখতে। তাঁরা যে গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানাবেন না এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তবেই তাঁদের কাছে দেহটি চাওয়া হয়েছিল। দেহ পাবার পর নিখুঁত ভাবে সব কিছু করা হলে জার্মানরা টোপটি ঠিকই গিলেছিল। ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স দলের এই সাফল্য আজ স্মরণীয় হয়ে আছে।

মৃতদেহ হাতে পেয়েই মণ্টেগু ঠিক করলেন ডুবোজাহাজে করে এটি পাঠানো হবে কাদিজ উপসাগরে। সেখানে একে জলে ভাসিয়ে দিলে জোয়ার আর হাওয়ার টানে পৌঁছে যাবে উপকূলে, হুয়েলভার মাটিতে। ওখানে আছেন এক জার্মান এজেন্ট, স্পেনীয় প্রশাসনের যিনি ঘনিষ্ঠ। মৃতের অধিকারে পাওয়া সব দলিল-পত্রই তাঁর হাতে একসময় আসবেই।

বরফে রাখা হল সেই মৃতদেহ নৌবাহিনীর মেজর-এর ইউনিফর্ম পরিয়ে। কাগজপত্রে ভরা একটি ব্রিফ কেস তার কোমরে চেন দিয়ে বাঁধা। পোষাক পরানো কাজটা বড় সহজ ছিলনা। সব থেকে কঠিন হয় জুতো পরানো। বরফে জমে দেহ পাথর হয়ে আছে, পায়ের পাতা না নড়লে জুতোয় ঢুকবে কি করে? নড়াতে হলে বরফ গলতে দিতে হবে। একবার গলিয়ে জুতো পরিয়ে আবার বরফ জমতে দিতে হবে। এতে দ্বিতীয়বার বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের পচন শুরু হবে। তখন সন্দেহ জাগবে মনে। সমস্যার সমাধানও পাওয়া গেল। শুধু পায়ের গোড়ালিতে তাপ দিয়ে বরফ গলানো হল, জুতো পরিয়েই আবার বরফ চাপা দেওয়া হল।

ব্রিফকেস-এ সব দলিল "ব্যক্তিগত ও নিতান্ত গোপনীয়" বলে

চিহ্নিত ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড নাই (Archibald Nye) লিখিত এক চিঠি। আর্চিবল্ড নাই ছিলেন ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফ-এর উপ-প্রধান। চিঠিটি লেখা জেনারেল আলেকজাণ্ডারকে, জেনারেল আইসেনহাওয়ারের আজ্ঞাধীনে ব্রিটিশ বাহিনীর একটি গ্রুপ পরিচালনার ভার যাঁর উপর ছিল। ওই চিঠি স্যার আর্চিবল্ড লিখেছিলেন মণ্টেগুর সঙ্গে পরামর্শ করেই। তারিখ দেওয়া হয়েছিল ২৩ এপ্রিল, ১৯৪৩। ব্যক্তিগত চিঠি, "মাই ডিয়ার অ্যালেক্স" দিয়ে শুরু। ব্যক্তিগত হলেও এতে ছিল এমন সব গোপন তথ্য যা অত্যন্ত বিশ্বস্তও নিতান্ত আপনার জন ছাড়া কাউকে লিখতে পারেন না অতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত একজন অফিসার। চিঠির বক্তব্য, সিসিলি থেকে মিত্রশক্তির পরবর্তী আক্রমণের পরিকল্পনা প্রচার মাত্র। এর উদ্দেশ্য শুধু জার্মানদের বিভ্রান্ত করা। আসলে মিত্রপক্ষের লক্ষ্য ভূমধ্য সাগরের অন্য একটি অঞ্চল—গ্রীস-এর কাছে। গ্রীস থেকে আক্রমণের কথা চেপে গিয়ে সিসিলির কথা বললে জার্মানরাও ছুটবে সিসিলির দিকে। সেই সুযোগে বিনা বাধায় গ্রীস-এ নেমে পড়া যাবে। এই সব কথা চিঠিতে ছিল।

ইউনিফরম পরা সেই মৃতদেহে পাওয়া পরিচয়পত্র থেকে জানা যাবে মৃতের নাম মেজর উইলিয়ম মার্টিন। নৌবাহিনীর মেজর। জন্ম কার্ডিফ-এ, ১৯০৭ সালে। অন্যান্য কাগজপত্রে টুকরো টুকরো ভাবে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে তা একত্র করলে দাঁড়াবে—তাকে বিমান পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়; সেখানে সমুদ্রপথে একটি অপারেশনে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে। এ কাজে তিনি একজন এক্সপার্ট, এই মর্মে দুটি চিঠিও ছিল তাঁর সঙ্গে। চিফ অব কম্বাইন্‌ড অপারেশন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন-এর লেখা। মেজর মার্টিন যে জেনারেল আলেকজাণ্ডারকে লেখা "গরম" ও অতি আর্জেণ্ট চিঠিটির বাহক একথাও লেখা ছিল মাউণ্ট ব্যাটেন-এর চিঠিতে।

এসব থেকে মেজর মার্টিন নামধারী নৌবাহিনীর যে এক অফিসারের ছবি ফুটে উঠবে তাকে পূর্ণতা দিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেরও কিছু খুঁটিনাটি দেওয়া প্রয়োজন। কোন দিকে কোন ফাঁক রাখা চলবে না, তাহলেই সন্দেহ দেখা দেবে। তাই তার সঙ্গে আরও দিয়ে দেওয়া হল তাঁর "প্রেমিকা ও ভাবী বধূ"র এক ছবি ও দুটি প্রেমপত্র। প্রেমিকার নাম দেওয়া হল পাম (pam)। প্রেমপত্র লেখানো হয়েছিল মণ্টেগুর অফিসের দুই মেয়েকে দিয়ে। এছাড়া ছিল বণ্ড স্ট্রীট-এর এক গয়নার দোকানের রসিদ। যা বলে দিচ্ছে ওই দোকান থেকে কেনা হয়েছে এনগেজমেণ্ট রিং। আর তিনটি চিঠি, একটি মার্টিন-এর বাবার ; একটি ব্যাঙ্ক-এর, ওভারড্রাফট সংক্রান্ত ; তৃতীয়টি সলিসিটারের, আসন্ন বিয়ের ব্যাপারে।

এবারে "স্বর্গত মেজর মার্টিন" তাঁর মিশনের জন্য প্রস্তুত। এক টিনের ক্যানেস্তারায় ড্রাই আইস-এ ঢেকে প্যাক করে দেহটি ভ্যান-এ করে লণ্ডন থেকে গ্রীনকক-এ নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে ডুবো জাহাজ "সেরাফ"-এ তোলা হ'ল ১৯৪৩-এর ১৮ এপ্রিলে। "সেরাফ" ৩০ এপ্রিল হুয়েলভার কাছে এল। পরদিন ভোর বেলা "সেরাফ" ভেসে উঠল। জোয়ার এসে গেছে, হাওয়ার গতিও উপকূলের দিকে। দেহ জলে ফেলে দেবার উপযুক্ত সময়।

ডুবোজাহাজের কেউ ঘুণাক্ষরে জানতেন না ক্যানেস্তারায় কি আছে, জাহাজের কমাণ্ডার লেফটেনাণ্ট এন.এ. জুয়েল ছাড়া। ক্যানেস্তারা থেকে দেহটি বার করবার সময় কয়েকজন অফিসারকে ডেক-এ থাকতে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেহটি ওখানে রেখে যাবার অন্য এক কারণ তাঁদের বলা হয়।

ক্যানেস্তারা খুলে দেহ বার করা হল। খুব ভাল করে দেখে দেহে পরানো লাইফ জ্যাকেটে হাওয়া ভরে ফুলিয়ে দিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। ভাসতে ভাসতে "মেজর মার্টিন"-এর দেহ বীচের দিকে রওনা হল।

লণ্ডনে তখন রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। খবরের প্রতীক্ষা। কি না

জানি হল। মে মাসের ৩ তারিখে মাদ্রিদ-এ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত-এর কাছ থেকে খবর এল। "মেজর মার্টিন"-এর জলমগ্ন দেহ উদ্ধার করেছে কয়েকজন জেলে। হুয়েলভাতে। দেহটি পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় কবর দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহে পাওয়া দলিলপত্র-র কথা কিছু বলা হয়নি খবরে।

এবারে লণ্ডনে কর্মব্যস্ততা। খুবই সাবধানে, গোপনে। স্প্যানিশরা নিশ্চয়ই দলিলগুলি খুঁটিয়ে দেখবে। দলিলের গোপন তথ্য ফাঁস হয়েছে ধরে নিয়ে লণ্ডন ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়বে এই আশা তারা নিশ্চয়ই করবে। হয়নি জানতে পারলে ধরে নেবে দলিলগুলি ভূয়া। কাজেই লণ্ডন থেকে স্পেনে ব্রিটিশ দূতাবাসে জরুরী নির্দেশ গেল, মেজর মার্টিন-এর মৃতদেহের যে সব কাগজপত্র পাওয়া গেছে সেগুলি যেন কারও হাতে না পড়ে, কিছু যেন ব্রিটিশ দূতাবাসের বাইরে না যায়। ১৩ মে পর্যন্ত ব্রিফকেসটি বিটিশ দূতাবাসে ফেরত আসেনি। পরে যখন আসে তখন খুলে দেখা যায় সব কাগজপত্র স্পেন-এ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার পর আবার ব্রিফকেসে রেখে সীল করে দেওয়া হয়েছে।

এর পরের ছবি অনুমেয়। মিত্রশক্তি সিসিলিতে নেমে দেখে জার্মানরা সেখান থেকে তাদের শিবির গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে। কোন এক স্বর্ণমৃগের পিছুপিছু।

মাদ্রিদ-এর জার্মান এজেণ্টদের অসুবিধা হয়নি ব্রিফকেসের দলিলগুলি পেতে। তারা সঙ্গে সঙ্গে বার্লিন-এ টেলিগ্রাম করে সব জানিয়ে দেয়।

লণ্ডনে জার্মানীর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি যারা করত বার্লিন থেকে তাদের কাছে গোপন নির্দেশ আসে, মেজর মার্টিন সম্বন্ধে খোঁজ নাও। তারা নেয়। মেজর-মার্টিন নামে কল্পচরিত্রটি সম্পর্কে সংগৃহীত সকল কাল্পনিক তথ্য সত্য বলে বিশ্বাস করে তারা বার্লিনকে সব জানিয়ে দেয়।

বার্লিনে এই সব তথ্য সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে সবাই মেনে নেয়। ভুয়া দলিলগুলি হস্তগত করার বিরাট কৃতিত্বও দাবি করা হয়। সবথেকে বড় কথা, এর পর জার্মানরা ভূমধ্যসাগরে তাদের রণনীতি আমূল বদলে দেয়, যার ফলে মিত্রশক্তি বিনা বাধায় সিসিলি থেকে অগ্রসর হতে পারে।

ছলনাটি প্রথম যাঁরা ধরতে পারেন তাঁদের অন্যতম তখনকার জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিব্বেনট্রপ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রিদে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে তীব্র ভাষায় তিরষ্কার করে চিঠি দেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

এর পরে পরেই আঙ্কারায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের এক ভৃত্য তার প্রভুর দপ্তরের কিছু অতি গোপন দলিলের ফোটো তুলে নেয়। দলিলগুলি একদম খাঁটি, যাতে ছিল কায়রো ও তেহেরান সম্মেলনের কিছু রিপোর্ট ও মিত্রশক্তির নর্মাণ্ডি আক্রমণের দিনটিতে কি করা হবে তার পরিকল্পনা। ওই ভৃত্য দলিলের ফোটোগুলি নিয়ে এক জার্মানগুপ্তচরের কাছে বিক্রি করে। ফোটো-গুলি সময়ে রিব্বেনট্রপ-এর হাতে যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, তিনি সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট-এ ফেলে দেন। একবারেই লোকে বোকা বনে। আবার ফাঁদে পা দেওয়া? কখ্খনো না।

এবারে ফাঁদে পা না দেওয়াটাই যে কাল হল তা কি রিব্বেনট্রপ পরে বুঝতে পেরেছিলেন? এ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি।

—ঃ ঃ—